৪৭তম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমাদের কথা | | |
| যত কাণ্ড নভেম্বরে | জ্যোতির্ময় সমাজদার | ২ |
| থ্রেট কালচার | মোহিত রণদীপ | ৩ |
| চাণক্য | দীপাবলী সেন | ৮ |
| পল জোহানেস ব্রুল | গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯ |
| অনুসরণকারীদের প্রতি | সোনাঝুরি মৈত্র | ১০ |
| বীণা দাস | সুব্রতা দাসগুপ্ত | ১২ |
| চিকিৎসার দ্বান্দ্বিকতা | সুগত দাশগুপ্ত | ১৪ |
| খাদ্যসংস্কৃতি | অরুণালোক ভট্টাচার্য্য | ১৭ |
| কৃত্রিম বৃষ্টি | অঞ্জনকুমার সেনশর্মা | ২০ |
| মিসিং ডোজ | গৌতম মিস্ত্রী | ২২ |
| কাশি-সর্দি কাফ সিরাপ | মনোজিৎ মণ্ডল | ২৪ |
| পরিচারিকাদের অবস্থান | রূপালী গঙ্গোপাধ্যায় | ২৬ |
| রামমোহন | নন্দগোপাল পাত্র | ৩০ |
| প্রতিবেদন | | ৩২ |


রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

**কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬**

**ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২**

**ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/**

**ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com**

**ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/**

**ISSN 0971-5800/RN.37375/80**

# আমাদের কথা

২০২৬-এ উৎস মানুষ ৪৬ পার করে ৪৭-এ পা দিল। ইংরেজি নতুন বছরে লেখক, গ্রাহক, পাঠক ও সকল সহযোগীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর থেকে গ্রাহক চাঁদা কিছুটা বাড়াতে হচ্ছে, কারণ পত্রিকা ছাপার খরচ ও ডাক খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়া। সরকারি ডাক ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকদের উৎস মানুষ পাঠানো হয়। সাধারণ ডাকে পাঠালে প্রাপক যে পত্রিকা পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই ডাক-গ্রাহকদের একমাত্র স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়। ইদানিং ডাক মাশুল এতটাই বেড়ে গেছে যে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। গ্রাহকদের সহযোগিতা পাবার আশা রাখি।

গত ২২ নভেম্বর দি থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার সভাকক্ষে পঞ্চদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তা মনোবিদ ও সমাজকর্মী মোহিত রণদীপ-এর বক্তব্য এই সংখ্যায় দেওয়া হল। 'কোরক'-এর শ্রীমতী কাবেরী রায় ও মেধা জানা 'আমার সোনার বাংলা...' ও 'মোদের গরব মোদের আশা...' গান দুটি গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। মোহিত 'থ্রেট কালচার' নিয়ে বললেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিলেন প্রবীর মুখার্জী, ডা.সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ডা. গৌতম মিস্ত্রী, আশীষ লাহিড়ী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্যামল ভদ্র।

আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি দেশের বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি অনুদান দিন-কে-দিন কমেই চলেছে। আমাদের মোট দেশীয় উৎপাদন-এর বাজার মূল্য-র (জিডিপি) ০.৬৪ ভাগ গবেষণা খাতের জন্য সরকারি বরাদ্দ। পরিমাণটা এতই কম যে বিজ্ঞান গবেষণা মুখ থুবড়ে পড়েছে। অথচ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বছর বছর বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করার দিক ছেড়ে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীরা ম্যানেজমেন্ট পড়ার দিকে ঝুঁকছে। মেধার উপযুক্ত মূল্যায়ন না হলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে পরমাণু বিদ্যুৎ প্রক্রিয়াকরণে

অসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করতে পারে, এই সংক্রান্ত বিল পেশ করা হয়েছে, যেখানে সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ দুর্ঘটনাজনিত বিশাল ব্যয় ভার সরকারকেই বহন করতে হবে, যা গভীর উদ্বেগের বিষয়।

দেশজুড়ে অযুক্তির স্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই স্রোতের টানে প্রশ্নহীন মানুষ ভেসে যাচ্ছে, এসব দেখে নবজাগরণের পথিকৃৎ-এর কথাগুলি আজও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। রামমোহন রায় ত্রিশ বছর বয়সে ফার্সি ভাষায় লেখেন, 'তুহফাত-উল-মুয়াহহিদীন', তাতে তিনি লিখছেন — 'কার্য-কারণ সম্বন্ধ না জানলে মানুষ একটাকে কারণ ও অন্যটাকে তার ফল বলে মেনে নিতে রাজি নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—কোনো সংগ্রাম না করে, অথবা কোনো রকমের প্রতিকারের চেষ্টা না করেই, কেবল প্রর্থনার জোরে বা তুক-তাক তাগা-তাবিজের গুণে, দুর্গতি দূর হয়েছে বা অসুখ সেরেছে, এ সবের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। ধর্মনেতারা তাদের শিষ্যদের সন্তোষের জন্য ব্যাখ্যা করেন—ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিতর্কের স্থান নেই, এবং ধর্মের ব্যাপার শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই, তা যুক্তিবিরুদ্ধ, তা একজন যুক্তিবাদী কী করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পরেন?' (রামমোহন রায়ের জীবনী---প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় উৎস মানুষের স্টল নম্বর ৪৮৩। বইমেলায় উৎস মানুষ প্রকাশনার বই ও পত্রিকা থাকবে সেই সঙ্গে একটা নতুন বই প্রকাশিত হবে। বইমেলায় এলে একবার আমাদের স্টলে ঘুরে যাবেন।

উমা

# অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ

## যত কাণ্ড নভেম্বরে (১৯৮১)

### জ্যোতির্ময় সমাজদার

আমি যখন উৎস মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই তখন মানুষ পত্রিকার দাম পঞ্চাশ (৫০) পয়সা থেকে বেড়ে এক (১) টাকা হয়েছে। মানুষের সামনে যোগ হয়েছে উৎস শব্দটি। সেটা ছিল ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাস। সেই নভেম্বরে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিষয়টা ছিল 'দ্য টেনথ্ ম্যান', অর্থাৎ হিসেবে দেখা যাচ্ছে প্রতি দশ (১০) জন মানুষের মধ্যে একজন মানুষ প্রতিবন্ধী। ১৯৮১ সালকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ বলে ঘোষণা করে। সেই উপলক্ষে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যে প্রদর্শনীর আয়োজন করে পোস্টার লিখতে পারার সুবাদে এবং খানিকটা আঁকিবুকি কাটার পারদর্শিতার জন্য আমাকে এই এক্সিজিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক্সিজিবেশন ভালই হয়েছিল, সাতদিনের এক্সিজিবেশন দশ দিন ধরে চলে। শেষ দিনে যখন কলেজের কমনরুমে তালা দিতে যাচ্ছি তখন দরজায় এসে হাজির দুজন সাংবাদিক। আমি প্রথমে তাদের পুলিশ ইনফর্মার বলে ভেবেছিলাম, কারণ সেই সময় সেটাই ছিল দস্তুর। তারা কেন এসেছে জানতে চাইলে বলেন যে তারা এই বিষয়ের কিছু তথ্য আমার পোস্টার থেকে নিয়ে যেতে চান। এইসব বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান এবং সেইটা করেন তাদের এক পত্রিকার মাধ্যমে যার নাম 'উৎস মানুষ'। কাকতালীয়ভাবে এই নভেম্বর মাসে 'উৎস মানুষে'র নাম আমি দ্বিতীয়বার শুনলাম। ওঁদের বললাম যে পোস্টারগুলো আমার হোস্টেলের খাটের তলায় থাকবে পরের দিন যেন সেখানে এসে যা যা তথ্য দরকার লিখে নেন। পরের দিন বিকেলে দেখি তারা হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তথ্য সংগ্রহের কাজের পাশাপাশি পকাইদা (প্রদীপ দত্ত) ও খোকনদা-র সঙ্গে আলাপ এগোতে থাকে। বারবার বলতে থাকেন তারা 'উৎস মানুষ' নামে একটা অসামান্য বিজ্ঞান পত্রিকা চালান এবং পত্রিকাটি দেড় বছরের বেশি সময় ধরে চলছে। সেই পত্রিকা গোষ্ঠীর নেতা ও সম্পাদক যিনি তাঁর নাম হচ্ছে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। পকাইদা যেটা বারবারই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলছিলেন, তিনি কর্তৃত্ববাদ বিরোধী এবং সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। আমি যেন এই চমৎকার মানুষটির সঙ্গে আলাপ করি।

পকাইদার সঙ্গে পরিচয়ের আগেই ওই নভেম্বর মাসেই আমার ক্লাসমেট ডাক্তার জয়ন্ত দাস আমাদের বলেছিল যে, সে একটি পত্রিকা কলেজ স্ট্রিটের স্টলে দেখেছে যার নাম 'উৎস মানুষ'। বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকাটি উল্টে-পাল্টে দেখে জয়ন্ত ঠিক করেছে মেডিকেল কলেজে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে তা প্রচার করা অত্যন্ত জরুরি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের এই যুগ্ম বিশেষ সংখ্যাটিতে একটি প্রবন্ধ ছিল 'কালী মায়ের নগ্নরূপ'—লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর,

যিনি নবদ্বীপের একজন পণ্ডিত মানুষ। জয়ন্ত নবদ্বীপের ছেলে। আমি আর জয়ন্ত ঠিক করলাম নবদ্বীপে জয়ন্তের বাড়িতে যাব এবং ওই প্রবন্ধে যে জায়গাটির উল্লেখ আছে সেখানে একবার দেখে আসব। পত্রিকা প্রচার-প্রসারের জন্য একটা প্ল্যান আমরা করেছিলাম, ১০টা 'উৎস মানুষ' কিনে মেডিকেল কলেজের বন্ধু এবং মাস্টারমশাইদের মধ্যে বিলি করব। মাস্টারমশাইদের তালিকায় আমাদের বিশেষ নজর ছিল আমাদের ফার্মাকোলজির প্রফেসর পীযূষকান্তি সরকারের দিকে। কারণ আমরা শুনেছিলাম স্যার গ্রামেগঞ্জে গিয়ে গরিব মানুষের সেবা করেন। বহু বছর পরে উৎস মানুষেই পীযূষকান্তি সরকার একটি নিবন্ধেএই কথাটির উল্লেখ করেন—গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে স্যারের প্রবেশ তার ছাত্রর মাধ্যমে উৎস মানুষের মধ্যে দিয়েই হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই বৈঠকখানা রোডে নিবারণ সাহার বই বাঁধানোর ঘরে পৌঁছে গেলাম। তখন ওটাই ছিল উৎস মানুষের অস্থায়ী ঠেক।

সেখানেই অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় হল। উৎস মানুষের মেডিকেল পর্ব এখানেই শেষ নয়। আমার বেশ মনে আছে উৎস মানুষ ঠিক করে নারী অধিকার এবং নারী মুক্তি নিয়ে উৎস মানুষের একটি দল তৈরি করা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে একদিন আমরা মেডিকেল কলেজের লেডিস হোস্টেল স্বর্ণময়ীতে হানা দিলাম। সেখানে চঞ্চলাদি (সমাজদার) এবং আরো কয়েকজন নবীন ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ হল, যারা পরে উৎস মানুষের নারী অধিকার এবং নারীশক্তি বিষয়ক কাজকর্মে যোগ দিয়েছিল। অর্থাৎ উৎস মানুষ ছাপার দেড় বছরের মধ্যেই মেডিকল কলেজে তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। উৎস মানুষ গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ছাড়াই উৎস মানুষের ভাবনাকে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা চিনতে পেরেছিল এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজেরাই তা ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগেই একজন সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন ভাবনায় সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিন্তায় বিশ্বাসে অবিশ্বাসে সঠিক ন্যায়সঙ্গত মানবিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে... উৎস মানুষ এবং অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভাবনাকে তারা উপলব্ধি করেছিল, তারিফ করেছিল। এখানেই উৎস মানুষ পত্রিকার সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রিকা পরিচালনায় এবং বিষয় চয়নের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকদার সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছে তখন তাঁর বয়স ছিল ৩১ বছর, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, মাথায় অনেক ভাবনা গিজগিজ করছে এরকম একজন তরুণ তুর্কি তার আশেপাশের অনেককেই আকর্ষণ করেছিল। অশোকদা তাঁর কাছের মানুষদের বা প্রিয় মানুষদের সম্বোধন করার আগে একটা গালাগালি দিয়ে শুরু করতেন। যারা এই গালাগালি খেয়েছে তাঁরা মানতেন অশোক তাদের ভালোবাসে ও ভরসা করে। পশ্চিমবঙ্গের গণস্বাস্থ্য এবং গণবিজ্ঞান আন্দোলনে উৎস মানুষের ভূমিকা এবং তার একজন উজ্জ্বল নেতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর দোষ ও গুণ যা আমার চোখে পড়েছে—

১) বিজ্ঞান আন্দোলনকে সাধারণ মানুষ এবং নবীন প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে কি করতে হবে তা নিয়ে অশোকদার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল। যার পদ্ধতি এবং বিষয় চয়ন নিয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল।

২) সেই যুগের দুই বাংলার গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী পত্রিকার পাঠক উপযোগী নতুন লেখক তৈরি করার ক্ষেত্রে অশোকদার চেষ্টা এবং সাফল্য অতুলনীয়।

৩) অশোকদার লাগাতার চেষ্টা ছিল পত্রিকার মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে গণবিজ্ঞানকে সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

৪) অশোকদা উৎস মানুষ পত্রিকাকে অপত্য স্নেহে আগলে রাখতেন এবং তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন যাতে উৎস মানুষ ঘরানার ভাবনাকে কেউ সংক্রমিত না করতে পারে।

৫) ঘরে বসে পত্রিকা নয়, মাঠে ঘাটে ঘুরে পত্রিকা পরিচালনা—যাকে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্র্যান্ড বলা যায়।

৬) বাংলার ছোট ছোট গণবিজ্ঞান পত্রিকাগুলিকে সর্বদা সাহায্য করা এবং ভাবনার আদান-প্রদান অশোকদার একটা প্রিয় বিষয় ছিল।

মনে হয় একদিন আকাশে শুকতারা
দেখিব না আর,
দেখিব না হেলেঞ্চার ঝোপ থেকে
এক ঝাড় জোনাকি কখন—
নিভে যায়,
দেখিব না আর
আমি এই পরিচিতি বাঁশবন....
জীবনানন্দ দাশ

উমা

# পঞ্চদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

## থ্রেট যারা দেয়, তারা নিজেরাই আতঙ্কে থাকে

মোহিত রণদীপ

তপন সিংহের 'আতঙ্ক' ছবির জনপ্রিয় সংলাপ 'মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেন নি!' এই ধরনের হুমকি দিয়ে মুখবন্ধ রাখা বা কাউকে দমিয়ে রাখার ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। তবে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের এক তরুণী শিক্ষার্থী-চিকিৎসকের কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন ও হত্যার প্রেক্ষাপটে সংবাদমাধ্যমের দৌলতে 'থ্রেট কালচার' শব্দবন্ধটি সাধারণের মধ্যে খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে।

এই থ্রেট বা হুমকির আবহ সর্বত্রই তৈরি হয়েছে। পাড়ায়, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, আদালতে, কর্মক্ষেত্রে — সর্বত্র। অবাধ্য হলে কিংবা কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই নেমে আসে হুমকি। এই প্রেক্ষাপটেই আমরা আজ এই থ্রেট বা হুমকির ব্যাপ্ত পরিসরকে একটু বোঝার চেষ্টা করব।

থ্রেট বা হুমকির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ভয় বা আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের বাস্তব ভিত্তি থাকতে পারে, কিংবা তা অনুমান-নির্ভরও হতে পারে। যখন আমরা কোনও থ্রেট বা ভয়ের মুখোমুখি হই, তখন তার তীব্র প্রভাব মনের ওপর দেখতে পাই। আমাদের মধ্যে দেখা দেয় নিরাপত্তাহীনতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয় বা আতঙ্ক। এর প্রভাব পড়ে চিন্তা-ভাবনার ওপর, আবেগ-অনুভূতির ওপর এবং আচরণের ওপর। মস্তিষ্কের মধ্যেকার অ্যামিগডালার মধ্যে ভয়কে জাগিয়ে তোলার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা সক্রিয় হয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে অতিরিক্ত সতর্কতা দেখা দেয়, তীব্র নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়, হারিয়ে ফেলি আবেগের নিয়ন্ত্রণ ও যুক্তিবোধ। ফলে যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তও নিতে পারি না। হয় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, কিংবা অতিরিক্ত ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চাই। থ্রেট বা হুমকির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যেতে থাকলে কিংবা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকতে থাকতে অনেক সময়ই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ের পাশাপাশি দেখা দেয় বিরক্তি এবং রাগও। অনেকেই আক্রান্ত হন নানা ধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, পোস্ট ট্রমাটিক কিংবা বিষণ্ণতা অসুখেও।

থ্রেট অনেক সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। সেই প্রাতিষ্ঠানিক থ্রেট-এর ক্ষেত্রে একটা কাঠামো থাকে। সেই কাঠামো ক্ষমতার। সেই কাঠামোর এক প্রান্তে থাকে ক্ষমতাধর কোনও ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী, অন্য প্রান্তে থাকে ক্ষমতাহীন কিংবা ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী।

কখন দেওয়া হয় থ্রেট কিংবা হুমকি? যখন ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনও আশঙ্কার মধ্যে থাকে। কেমন আশঙ্কা? ক্ষমতাধরের আশঙ্কা, অন্য প্রান্তে থাকা ক্ষমতাহীন সেই ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী যদি তার কোনও অপরাধ জেনে ফেলে, তার অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, যদি তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধে, যদি তার ক্ষমতাকে অমান্য করে, তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে! ক্ষমতাধর প্রতি মুহূর্তে ভয় পায়। ভয় ক্ষমতা হারানোর। ভয় তার ধরা পড়ে যাওয়ার। আসলে ক্ষমতাধর ভয় পায় ক্ষমতাহীনের সাহসকে, ক্ষমতাহীনের সঙ্ঘবদ্ধতাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমরা ভয় পেতাম হিংস্র বন্যপ্রাণীকে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়কে। সেই ভয় থেকেই আমরা

একসময় সৃষ্টি করি ঈশ্বরকে। সেই ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে এসে হাজির হয় একদল ধুরন্ধর শ্রেণির মানুষ, যারা অন্যদের ভয় দেখানোর কারবার ফেঁদে বসে। ঈশ্বর-আল্লাহর নামে নানা ধরনের বিধিবিধান তৈরি করে তারা ভয় দেখানো শুরু করে। এই ভয় থেকেই জন্ম ভক্তি। ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে, ধর্মীয় বিধিবিধানের নামে ভয় দেখানোর, হুমকি দেওয়ার এক সংস্কৃতি যেন সামাজিক মান্যতা অর্জন করে বিশ্ব জুড়েই। প্রায় সব ধর্মবিশ্বাসেই মৃত্যুর পরে পরলোক, নরক, কিংবা দোজখের ভয়াবহ শাস্তি কিংবা পরজন্মে অপার দুর্ভোগের হুমকি দেখানোর ব্যবস্থা প্রবলভাবেই কায়েম রয়েছে। ঈশ্বর-আল্লাহর ঠিকা নেওয়া যাজক, পুরোহিত, মৌলবিদের হুমকিতন্ত্রের সেই ট্র্যাডিশন এই একবিংশ শতাব্দীতেও পুরো দস্তুর চলছে। এই হুমকিতন্ত্র নিজের ধর্মের বিশ্বাসী মানুষদের ওপর যেমন চলে তেমনি চলে অবিশ্বাসী কিংবা ভিন্ন ধর্মের মানুষের ওপরেও। বেশিরভাগ ধর্মেই একটা অলিখিত ক্ষমতার কাঠামো রয়েছে। তার উপরিতলে হয় সামন্তপ্রভু কিংবা যাজক বা পুরোহিতের স্থান। সনাতন বা হিন্দুধর্মে অবশ্য সেই ক্ষমতার কাঠামো লিখিতভাবেই ঘোষিত। যেখানে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের বাহু, বৈশ্যের জানু এবং শূদ্রের পা থেকে। ক্ষমতার এই পিরামিড-বিন্যাস আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চবর্ণের বহু মানুষের মনেই এখনও অটুট। সেই বিন্যাসের জোরেই ক্ষমতাধর সম্প্রদায়ের আস্ফালনে এখন আর কোনও আড়াল থাকে না। এখানে হুমকিতন্ত্রের শিকার হতে হয় পিরামিডের নিচের তলার মানুষদের। আমাদের দেশে এখনও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতিটি দিন কাটাতে হয় 'উঁচু জাতের' হুমকির মধ্যেই।

ক্ষমতার এই বিন্যাসে নারীর অবস্থান সবস্তরেই নিচের সারিতে। বিজয় তেণ্ডুলকরের লেখা 'কন্যাদান'-এ সেই ছবি আমরা দেখতে পাব। যাঁরা লিঙ্গ-যৌনতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থানে, তাঁদের পরিস্থিতি যথেষ্ট খারাপ। বহু রকমের হুমকির মুখোমুখি হওয়া তাঁদের প্রতদিনের যাপনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আমরা যে পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে বড় হয়ে উঠি, সেই কাঠামোর বিন্যাসেও অলিখিত ক্ষমতার উপস্থিতি থাকে। ছোটদের বাড়ির বড়দের কথা শোনা, মান্য করাই নিয়ম। সেই নিয়ম থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও গর্হিত বলে মনে করা হয়। শীতল কণ্ঠে শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের সেই শৈশবেই হয়েছে খুব কাছের মানুষদের কাছ থেকেই। শৈশবেই স্কুল নামক যে প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় কেটেছে আমাদের, সেখানে নানাবিধ কারণে বকাঝকা, শাসানি, হুমকির সামনে পড়ার অভিজ্ঞতা কমবেশি সব ছাত্রছাত্রীরই হয়েছে।

পরিবারে ও স্কুলে যেসব হুমকির মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে, সেই সব হুমকির নেপথ্যে হয়তো থেকেছে আমাদের সম্পর্কে ভাবনা। যার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিশে থেকেছে আমাদের সম্পর্কে বড়দের উদ্বেগ, যাতে বিগড়ে না যাই। আমাদের ভালোর জন্য উদ্বেগ।

কিন্তু, যখন সমাজের বৃহত্তর পরিসরে 'মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি', সংলাপ প্রতিদিনের বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার অভিঘাত একেবারে অন্যরকম হয়। বর্তমানে যে সমাজ-বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে চলেছি, সেখানে শাসানি কিংবা হুমকির অভিজ্ঞতা জন্মস্থান মাতৃসদন থেকে শ্মশান—সর্বত্রই ঘটে থাকে।

প্রতিদিনের যাপনে বহু ক্ষেত্রেই নানা রকমের শাসানি কিংবা হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। কোনও অনিয়মের প্রতিবাদ যদি আপনি করেন হুমকি শুনতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললে প্রতিপক্ষের হুমকির মুখে পড়তে হয়, ডিজে কিংবা তারস্বরে মাইকের উৎপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে হুমকির মুখে পড়তে হবে, পরিবেশ ধ্বংস করে কংক্রিটের নির্মামে বাধা দিলে রাজনৈতিক দাদা-দিদিদের চোখরাঙানি অবধারিত, সাট্টা-জুয়া কিংবা মদ খেয়ে অভব্যতার প্রতিবাদ করলে, গরিব মানুষ বা বয়স্ক অথবা নারী/তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করলে শুনতে হবে হুমকি। প্রতি ক্ষেত্রেই হুমকিদাতারা বলীয়ান থাকে রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের বরাভয়ে। সেই দলটি যদি ক্ষমতাসীন হয়স তাহলে তো কথাই নেই! সেই ক্ষমতার প্রতাপে পুলিশও প্রকারান্তরে হুমকিদাতারই পক্ষ নেয়। এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয় বহু মানুষকেই, এই চিত্র রাজ্য তথা এই দেশের সর্বত্রই। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় গুণ্ডামি মস্তানি আগেও ছিল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি শাসকের হুমকি, প্রতি-হুমকির নিদর্শন প্রতিদিন খবরের কাগজ, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি। সেগুলোর ভাষা শালীনতার সব সীমা অতিক্রম করে যায় বহু ক্ষেত্রেই। মাত্রা বেড়ে পৌঁছে যায় অধঃপতনের সীমায়।

ক্লাবসংস্কৃতি ডিজে-সাউণ্ড সহকারে নানাবিধ পুজো ও উৎসব, মদের মৌতাত এবং উৎকট নাচাগানায় বুঁদ বঙ্গীয় যুবসমাজের একটা বড় অংশ। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। কোনও

ভবিষ্যৎ নেই। সামনে শুধু দোদুল্যমান প্রোমোটারি, সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির গাজর। স্কুলপড়ুয়া মজে বিনি পয়সায় পাওয়া স্মার্ট ফোনে। এতে পড়াশোনার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়। আমরা, যাঁরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করি, তাঁরা প্রতিদিন যত সমস্যা দেখে থাকি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় থাকে কমবয়সীদের স্মার্ট ফোন নির্ভরতার সমস্যা। পড়ুয়াদের মনঃসংযোগ, একাগ্রতা, স্মৃতি, চিন্তার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, সৃষ্টির ক্ষমতা ... সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চলে যায় পড়াশোনার ইচ্ছেটাই। আর পড়াশোনার ইচ্ছেই যদি কমে যায়, এদের মধ্যে কতজনই বা পারবে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে? কোভিড পর্বেই সব প্রতিষ্ঠান বুঝে গিয়েছে, দশজনের কাজ একজনকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। বাকি ন'জনের কী হবে? এরাই হবে আগামী দিনের অনুগত সৈনিক। এদের দিয়েই বজায় থাকবে হুমকিতন্ত্র।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও নীতিবিশেষজ্ঞ লর্ড অ্যাক্টন বলেছিলেন, ক্ষমতার প্রবণতাই দুর্নীতির দিকে ধাবিত হওয়া। একচ্ছত্র ক্ষমতা একচ্ছত্র দুর্নীতির জন্ম দেয়। লক্ষ্য করা গিয়েছে, ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতার বোধ ক্রমশ কমতে শুরু করে। ক্ষমতা মনের মধ্যে জন্ম দেয় দম্ভের। সেই দম্ভ থেকেই মানুষ হারাতে থাকে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ। সুনীতি ও দুর্নীতির পার্থক্য তখন অস্পষ্ট হয়ে যায়। যে কোনও প্রকারে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর ক্ষমতার পরিধিকে প্রসারিত করাই তখন লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ক্ষমতাশালীর অহমিকা ভিন্নমতকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতার জন্ম দেয়। তুচ্ছ হয়ে যায় সততা, অহিংসা, সহমর্মিতার মতো মানবিক বোধ। গুরুত্ব হারায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সাংবিধানিক নিরপেক্ষতার মতো বৃহত্তর দায়বদ্ধতা। দুর্নীতি ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নেয়। আমাদের রাজ্য তথা আমাদের দেশ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে প্রাণ দিয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে যেমন সরকারি কর্মচারী আছেন, সাংবাদিক আছেন, তথ্যের অধিকার আন্দোলনের কর্মী বা সাধারণ নাগরিক আছেন, আছেন শিক্ষার্থী-চিকিৎসকও। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে সোনালী চতুর্ভুজ হাইওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতির হদিশ পেয়ে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ দুবে গোপন চিঠি লিখেছিলেন সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। সেই চিঠি প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকেই ফাঁস হয়ে যায়। নির্মমভাবে খুন করা হয় তাঁকে গয়াতে। একজনও শাস্তি পায়নি! আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী-চিকিৎসকও শহিদ হলেন হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার 'অপরাধে'-ই। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ কিংবা শিক্ষার্থী-চিকিৎসককে নির্মমভাবে হত্যা শুধুমাত্র ওঁদের শাস্তি দেওয়া নয়, সমস্ত প্রতিবাদীদের প্রতি অপরাধ—সিন্ডিকেটগুলোর হুঁশিয়ারিও।

সাম্প্রতিক কালে আমরা এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধারেরা কথায় কথায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে নানা হুমকি দিয়ে চলেছেন। কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী শাসকেরা দেশের যাবতীয় সমস্যার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করছেন তাঁদের। সেই হুমকিতে এখন আর আড়াল থাকছে না। বহু ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজকর্মী, সাংবাদিকদের মিথ্যা অজুহাতে দিনের পর দিন জেলে বন্দী করে রাখা হচ্ছে। গত বেশ কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে ধর্মান্ধতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সন্দেহ, ঘৃণা আর বিদ্বেষের চাষ চলেছে। ফলে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের একটা বড় অংশের মনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করেছে। এতে তাদের প্রতিনিয়ত নানাবিধ হুমকির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আসামে এনআরসি-র সময় থেকে তা গুরুতর রূপ নিয়েছে।

ইদানীংকালে ডিজিটাল সমাজমাধ্যম হয়ে উঠেছে হুমকি দেওয়ার নতুন ক্ষেত্র। তদন্তভিত্তিক সাংবাদিক এবং অভিব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লেখক স্বাতী চতুর্বেদী তাঁর সরকার-বিরোধী অবস্থানের কারণে সমাজমাধ্যমে নিরন্তর হেনস্থার শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে ফেলেছেন আস্ত বই 'আই অ্যাম আ ট্রোল'। টুইটারে বেনামে হিন্দুত্বপন্থী একাধিক অ্যাকাউন্ট থেকে ভয় দেখানো হয় নির্ভয়ার মতোই ধর্ষণ করা হবে কিংবা একে ৪৭ রাইফেল থেকে গুলি করে মারা হবে। এমন হুমকি প্রতিবাদী মানুষ, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, মহিলাদের লক্ষ্য করে প্রায় সব সমাজমাধ্যমেই চলতে থাকে। খুব কম ক্ষেত্রেই অপরাধী চিহ্নিত হয় বা সাজা পায়। স্বাতীকে যারা হুমকি দিয়েছিল তারা আজও অধরা। কারণ তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের সংযোগ আছে। ইদানীং 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নামে এক ধরনের সাইবার অপরাধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারও মূল চাবিকাঠি নানা ধরনের মিথ্যে মামলা ও অপরাধ-জালে ফাঁসানোর হুমকি।

যাঁরা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মতের অনুসারী নন, যেমন বাউল, ফকির, কবীরপন্থী কিংবা নিরীশ্বরবাদী—তাদের

নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রায়শই হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। বহু ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হামলার মুখোমুখি হয়েছেন নিরীশ্বরবাদীরা। আমাদের দেশে মুক্তচিন্তার অন্যতম প্রচারক নরেন্দ্র দাভোলকর, গোবিন্দ পানেসর, এম কালবুর্গি এবং গৌরী লঙ্কেশ ধর্মান্ধদের সংগঠন 'সনাতন সংস্থা'র সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

মুক্তমনা মানুষের রক্ত ঝরেছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মাটিতেও। আক্রান্ত হয়েছেন বিশিষ্ট কবি ও লেখক হুমায়ুন আজাদ। শহিদ হয়েছেন রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, নীলাদ্রী নিলয়, অনন্তবিজয় দাস, ওয়াশিকুর বাবু, শাহজাহান বাচ্চু, ফয়সল আরেফিন দীপন, জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব রাব্বি। এঁরা প্রত্যেকেই মুক্ত চিন্তার গবেষক ও সমাজকর্মী।

দেশের বর্তমান হিন্দুত্ববাদী সরকার খাদ্যের অধিকারের সরব ফাদার স্ট্যান স্বামী, কবি ভারভারা রাও, আনন্দ তেলতুম্বড়ে, সুধা ভরদ্বাজ, গৌতম নওলখা, সোমা সেন, জি সাইবাবা সহ বহু সমাজকর্মী-সাংবাদিককে মিথ্যা অভিযোগে জেলে পুরেছে। জেলের মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন স্ট্যান স্বামী। প্রায় প্রতিদিন বস্তারসহ পশ্চিমবঙ্গের বেলপাহাড়ি থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত বনভূমি, যা ভারতের ফুসফুস বলে পরিচিত, কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জঙ্গল ধ্বংস করে খনিজ সম্পদের দখল নিতে চায়। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আদিবাসী মানুষ এবং প্রতিবাদীদেরএনকাউন্টারের নামে নির্মমভাবে হত্যা করছে দেশেরই সরকার। এই নির্মম হত্যালীলা সমগ্র আদিবাসী সমাজের জন্যই শুধু নয়, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের প্রতিই একটা থ্রেট।

এই সমস্ত থ্রেটকে অস্বীকার করার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বা রাজ্যে খুব কম নেই। একথাও নিশ্চয়ই মনে রাখব, থ্রেট যারা করে, তারা নৈতিকভাবে দুর্বল, তা তারা খুব ভালো মতোই জানে। সেই জন্যেই এত থ্রেট, হুমকি, চোখরাঙানি।

প্রসঙ্গত একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, ২০১৯-এ কেন্দ্রের হিন্দুত্ববাদী সরকার দ্বিতীয় পর্বে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক আক্রমণ নামিয়ে আনছিল প্রতিবাদীদের ওপর। ওই বছরের ৫ আগস্টের ঠিক আগে জম্মু-কাশ্মীরে হঠাৎ নিরাপত্তা বাহিনীর সক্রিয়তা বেড়ে যায়। মোবাইল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের ফিরে যেতে বলা হয়। একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়। নিজেকে তখন মনে হয়েছিল অবরুদ্ধ কাশ্মীরের একজন মানুষই। যাকি প্রতিমুহূর্তে থাকতে হচ্ছে রাইফেলের নলের সামনে, প্রতি মুহূর্তের চলাফেরায় চলছে রাষ্ট্রের নজরদারি। তীব্র উদ্বেগ আর বিষণ্ণতার শিকার হয়ে পড়ি নিজেই। তা কাটিয়ে উঠেছিলাম ডিসেম্বরের শেষদিকে, যেদিন প্রথম জেএনইউ এবং জামিয়া মিলিয়ার ছাত্রছাত্রীরা অনেক রাতে গান্ধী এবং আম্বেদকরের ছবি নিয়ে ঘেরাও করে দিল্লি পুলিশের সদর দফতর। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধই সেদিন দেখিয়েছিল ভয়কে অস্বীকার করার পথ। ওড়িশার নিয়মগিরির প্রতিরোধ আন্দোলন, এনআরসি-সিএএ বিরোধী শাহিনবাগ আন্দোলন, কর্পোরেট স্বার্থে রচিত কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লির কৃষক আন্দোলন, ক্ষমতার দম্ভকে অসার প্রমাণ করেছে। শাহিনবাগ আন্দোলনের পর্বে দিল্লির একটি মিছিলের সামনে থাকা সেই তরুণকে ভুলতে পারি না, যার দিকে তাক করে রিভলভার নিয়ে এগিয়ে আসছে হুমকি দিতে দিতে এক ধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদী, আর সেই তরুণ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, 'এসো বন্ধু কথা বলি'। এরপরেও সেই তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। হয়তো লকডাউনই সেই যাত্রায় রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছিল সরকারের।

আমাদের রাজ্যেও ২০২৪-এর ১৪ আগস্টের রাত ক্ষমতার রক্তচক্ষুকে অস্বীকার করে গর্জে ওঠার দিন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে প্রতিস্পর্ধার ইতিহাসে।

এই আলোচনা শেষ করতে চাই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা দিয়ে।

"চোখ রাঙালে না হয়
গ্যালিলিও লিখে দিলেন,
পৃথিবী ঘুরছে না।
পৃথিবী তবুও ঘুরছে, ঘুরবেও
যতই চোখ রাঙাও না।"

উমা

**বইমেলার স্টল নম্বর ৪৮৩**
**৯ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে**
**লিটল ম্যাগাজিন**
**প্যাভিলিয়ানের পাশে।**

# চাণক্য প্রতিহিংসা বৃত্তির দ্বারা চালিত হতেন

দীপাবলী সেন

চাণক্য নাকি জন্মেই ছিলেন দু-পাটি দাঁত নিয়ে। তাঁর পিতা 'ঋষি' চণক সঙ্গে সঙ্গে নাকি সে-দুটি উপড়ে ফেলেন। তাঁর ধারণায় এটা দুর্লক্ষণ, ব্রাহ্মণ হয়ে রাজা হবার পূর্বাভাস। নবজাত শিশুটির বেদনার কথা ভাবলে শিউরে উঠি। ৬-৭ বছর অবধি দন্তহীন থাকার কষ্ট তো চাণক্যকে পেতে হয়েছিল। তার ওপর চোয়ালের গঠন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল কিনা, নতুন দন্তোদ্গম হয়েছিল কিনা, নতুন দাঁতের পাটি কেমন হয়েছিল ইত্যাদি, কে জানে! (এই জনশ্রুতির প্রকারান্তরে, মা-বাবা দুজনে মিলেই নাকি এ কাজটি করেছিলেন, দেবদূতটা পটনায়ক, ইকনমিক টাইমস, মার্চ ১৮, ২০০৩)।

পিতার উপরে তাঁর কোনো রাগ ছিল এমন মনে হয় না, কারণ চণক নাকি মারা গিয়েছিলেন কুশ ঘাসে পা ছড়ে গিয়ে আর চাণক্য তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন কুশঘাসের চাপড়া নির্মূল করে। নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন লক্ষ্য করেছিলেন চাণক্য কুশ ঘাসের গোড়াগুলোতে মধু ঢেলে দিচ্ছেন, যাতে পিঁপড়েরা ওগুলো খেয়ে ফেলে আর ঘাস সব নির্মূল হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন নন্দ বংশকে যদি কেউ নির্মূল করতে পারে, তা ইনি। বস্তুত চাণক্যনীতির একটি প্রধান সূত্র এর মধ্যেই নিহিত। শত্রুকে বিনাশ করতে হবে, তার শেষ রাখলে চলবে না, কিন্তু কোনো মিত্র-শক্তি খুঁজে নিয়ে, তার মাধ্যমে। এটাই তিনি সম্প্রসারণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'মণ্ডল তত্ত্ব' দিয়ে।

পিতার আচরণের প্রতি কোনো আপত্তি তাঁর ছিল না, তাঁর ঐ কুসংস্কারটির প্রতি তাঁর কোনো প্রতিবাদ ছিল না। আমরা চাণক্য বা কৌটিল্য সম্বন্ধে একটি গর্বভাব পোষণ করি, তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা ভাবি। নয়াদিল্লির প্রধান সব এম্ব্যাসি চাণক্যপুরীতে অবস্থিত। কৌটিল্য মার্গ চলেছে তাদের মধ্য দিয়ে। কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, কৌটিল্য এই এ এস (দিল্লি), কৌটিল্য ল একাডেমি (পাটনা), গ্রীক বা রোমান চিন্তাধারার কথা উঠলে আমাদের অনেকেরই মনে আসে যে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার আমাদেরও তো এক প্রতিভূ আছেন। তাঁর অর্থশাস্ত্র পুঁথিটিও আমরা প্রচলিত ইকনমিক্স (অনুবাদে অর্থনীতি) বলে ভাবি। দেখো, আমাদেরও আছে! এমন একটা ভাব।

ফুটপাতেও বিছিয়ে থাকে চাণক্যর উপর ইংরিজি বা হিন্দিতে লেখা সেকেন্ড হ্যান্ড বই, যা বেস্ট সেলিং বলে বিজ্ঞাপিত। কাজে লাগবে ভেবে ছাত্রদের কেনা।

মলাটের চাণক্যের ছবিটিও অনুরূপ ধারণায় আঁকা। রোষ-দৃষ্টি, খিঁচিয়ে-থাকা এক মুণ্ডিত মস্তক, টিকিটি কখনো আবার খোলা, যেমন দ্রৌপদীর বেণী।

চাণক্য প্রতিহিংসা বৃত্তির দ্বারা চালিত হতেন, যুক্তির দ্বারা নয়। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, শিক্ষিত করেছিলেন বলা যায় না। তাঁর চিন্তাধারা তার মধ্যে প্রবাহিত করেন নি, কারণ তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভোলেননি যে তিনি ব্রাহ্মণ, হয়ত উৎপাটিত দন্তরাজির পিতৃদত্ত বেদনা তাঁর আমৃত্যু রয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে চন্দ্রগুপ্তও ভোলেন নি, সম্রাট হয়েও তিনি শূদ্র বই আর কিছু হতে পারেন নি, পারবেন না। হিন্দু সংরচনায় তা সম্ভবই নয়। তিনি জৈন ধর্ম অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। লোকমানুষ যুক্তিনির্ভর প্রাণী। ম্যান ইজ এ র‍্যাশনাল অ্যানিমাল। সব মানুষ সমান। অল মেন আর ইকুয়েল। এরকম কোনো কথা চাণক্যনীতিতে নেই।

আধুনিক অর্থনীতির প্রতিপাদ্যগুলি প্রমাণ করতে গিয়ে প্রথমেই ধরে নিতে হয় একটি 'র‍্যাশনালিটি অ্যাসামম্পশন', বেচা-কেনা হিসাব-কিতাব যা কিছু মানুষ করে, তা করে যুক্তি অনুসারে। এই দিক থেকে দেখলে, চাণক্যকে আধুনিক অর্থনীতির আওতায় ফেলা যায় না।

হয়ত তাই, অর্থনীতির সিলেবাসে সাধারণত চাণক্য-বিরচিত অর্থশাস্ত্র পুঁথিটিকে পাওয়া যায় না। যায় পলিটিক্যাল সায়েন্স বা ফিলসফির মধ্যে। ইকনমিক্সে বড়জোর হিস্ট্রি অফ ইকনমিক থট নামে স্পেশাল পেপারটি নিহিত থাকে।

আবার কিশোরদের জন্য এর সুখপাঠ্য অনুবাদও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। শামা শাস্ত্রীর ১৯০৪-এ মহীশূর গভর্নমেন্ট ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে আবিষ্কৃত প্রাচীন পুঁথিটির প্রসার হচ্ছে, বিভিন্নভাবে। বস্তুত, অর্থশাস্ত্র নাম হলেও ভীষ্মের রাজধর্ম বা বিদুরনীতি এমনকি বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রর পাশেই এর উপযুক্ত স্থান। এমনকি কিছু সূত্র বা উপকথারও মিল পাওয়া যায়। যেমন, পশ্য সিংহ বা যদভবিষ্য বিনশ্যতি।

ভারতীয় কূটতন্ত্রের মূলগত উপাদান এই। বুদ্ধি ও

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। অহিংসা নয়। তিনি ভীষ্ম বা বিদুরের তুলনায় চাণক্যকে আমরা তবু একটু বিশেষ স্থান দিয়ে থাকি, পৃথক একটা মর্যাদা। তার কারণ তিনি একটি বাস্তব ঐতিহাসিক চরিত্র এবং তাঁর সূত্র বা নীতিগুলির এম্পিরিক্যাল টেস্ট বা বাস্তবিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়ে গেছে এদের ভিত্তিতে। দাঁত উপড়ে দিলেও, শিশু চাণক্য তাঁর রাজলক্ষণ ফুটিয়ে তুলেছিলেন, পিতার সংস্কার নেহাত ভুয়ো প্রমাণিত হয় নি। তারপর চাণক্য ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর জাত ব্যবসাতে, শাস্ত্রপ্রণেতা পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন পুরোপুরি।

একাধিক সূত্রে তিনি পণ্ডিত হওয়াকে রাজা হবার থেকে শ্রেয় বলেছেন। বিদ্বত্তমচ নৃপত্বমচ নৈব তুল্য কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। ঘরে ঘরে চলতো। আমার মা তাঁর বাল্যে শেখা এই পংক্তি দুটি শেষ বয়স অবধি মাঝেমাঝেই নাতিদের শোনাতেন।

হয়ত ছাত্র বা শিষ্য হিসেবে চন্দ্রগুপ্তকে হারানোর জন্য, নয়তো নিজেকে পুনরাবিষ্কার করে পিতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চাণক্য 'কিং-মেকার' হবার মোহ থেকে নিজেকে নির্মমভাবে মুক্ত করেছিলেন। কে জানে ঠিক কেন, তবে পিতা যে তাঁর অতি সাঙ্ঘাতিক রকম সংস্কারবদ্ধ ছিলেন, সেটা জানতে একটি নবজাতকের দুধের-দাঁত টেনে ফেলে দেবার চেষ্টা করেই দেখুন না!

উমা

# ভারতপ্রেমী বহুবিদ বিজ্ঞানী পল জোহানেস ব্রুল

## গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আজকের শিবপুর আই আই ই এস টি (বিই) কলেজে অধ্যাপক পল জোহানেস ব্রুল (১৮৫৫-১৯৩৫) সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি নাম। এমনকি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেও আমি যখন এই কলেজের স্নাতক স্তরের ছাত্র ছিলাম তখনও কোনোদিন অধ্যাপক ব্রুলের নাম শুনিনি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, তিনি অন্তত ২৫ বছর (১৮৮৭-১৯১২) এখানে ছিলেন এবং সেই সময়ে বহু মূল্যবান কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য শিবপুর কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় প্রকাশিত সুভেনিরটিতে তাঁর ছবি সহ কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বেশ গুরুত্ব নিয়ে বলা হয়েছিল।

অধ্যাপক ব্রুলের নাম শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা ছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। অন্তত তিনটি লেখায় তিনি অধ্যাপক ব্রুলকে শ্রদ্ধা আর প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ডাঃ ব্রুহল তখন শিবপুর কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ান—আর সেখানে নানা ধরনের সূক্ষ্মযন্ত্র - তৌলমাপ খাড়া করেছেন যা এ দেশে প্রেসিডেন্সি কলেজেও ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানে এম এস-সিতে স্বহস্তে কাজের নিপুণতা দেখাতে যেতে হতো ব্রুলের Laboratoryতে, সে বড় কঠিন ঠাঁই। বেশির ভাগ ছাত্র বিপদে পড়তেন। তবে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে কেউ কেউ বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল আমাদের পূর্বগামীদের মধ্যে। ..." সত্যেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন, "[তিনি] বিজ্ঞানের সব বিষয়েই পারদর্শী — সামান্য সহায়কের চাকরি থেকে শুরু করে উঠেছেন বহুদূর। পড়ার অভ্যাস চিরকাল আর বিজ্ঞানের নানা বই সংগ্রহ করে রেখেছেন নিজের গ্রন্থাগারে। আমরা সেখানে অনেক মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বই আবিষ্কার করলাম — ধার নিয়ে এলাম—Planck, Boltzmann, Wien ইত্যাদি, আর কি চাই!"

শুধু সত্যেন্দ্রনাথ নন, মেঘনাদ সাহাও ব্রুলের কাছে সমান ঋণী। তিনি আগে থেকেই জার্মান ভাষা জানতেন, সেটাকে আরো শানিয়ে নেন ব্রুলের কাছে। তিনি ব্রুলের কাছে ম্যাক্স

প্ল্যাংক, ভোল্টের নার্নস্ট প্রমুখ বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানীর কিছু বইয়ের সন্ধান পান। দুই বন্ধু মিলে এ ছাড়াও ফন লাউ প্রমুখ বিজ্ঞানীর আধুনিকতম বইগুলির সন্ধান পেয়ে উপকৃত হলেন। বস্তুত এইভাবেই এদেশে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান চর্চার সূচনা হয়।

অথচ এই ব্রুল কিন্তু মূলত ছিলেন উদ্ভিদবিদ্যার কৃতী ছাত্র ও গবেষক। জার্মানি থেকে বহু দেশ ঘুরে ভারতে এসে তিনি প্রথমে রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর শিবপুর বট্যানিকাল গার্ডেনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্যার জর্জ কিং-এর অনুপ্রেরণায় চলে আসেন শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে — সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক হয়ে। উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণা তখন তাঁর অবসর সময়ের কাজ। ১৮৯৬ সালে বেরোয় স্যার জর্জ কিং এবং পি জে ব্রুলের যৌথ গবেষণা গ্রন্থ : এ সেঞ্চুরি অব নিউ অ্যান্ড রেয়ার ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টস্। বইটি এতটাই স্বীকৃতি পায় যে ১৯৭১ অবধি এর ১৮টি সংস্করণ হয়েছিল। এছাড়াও তিনি উদ্ভিদবিদ্যায় আরো অনেক গবেষণার কাজ করেছিলেন। ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর ছাত্র কালীপদ বিশ্বাস জানিয়েছেন, অন্তত চোদ্দটি ভাষায় তাঁর কম বেশি দক্ষতা ছিল। শিবপুরে তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাশাপাশি রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, খনিজবিদ্যা, তাপীয় ইঞ্জিন আর কৃষিবিজ্ঞানও পড়িয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজেও ভূতত্ত্ব আর খনিজবিদ্যা পড়িয়েছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজেও ভূতত্ত্ব আর খনিজবিদ্যা পড়িয়েছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ব্রুল কিছুদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাজ করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ রাজেশ কোচার তাঁর সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন : ''যে সময় ঔপনিবেশিক শিক্ষা কৃত্যকের বেশিরভাগ উচ্চপদে আসীন হতেন 'স্কটল্যান্ড থেকে আগত তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা,' সেই সময় এই পণ্ডিত, নিবেদিতপ্রাণ ইউরোপীয় মানুষটি ছিলেন ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে এক মস্ত সম্পদ।''

উমা

# অনুসরণকারীদের প্রতি

## সোনাঝুরি মৈত্র

একে যে ছিল রানী। রানীর রাজসভায় সকাল থেকেই অদ্ভুত এক গন্ধ। চুনের ধুলো, সীসার পাউডার আর আতরের উগ্র গন্ধ মিশে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ এক মায়া—যেন বাতাসও বিষাক্ত সৌন্দর্যে ভরা। রানীর মুখে সাদা রঙের বীভৎস আস্তরণে। তিনি হাসলে ঠোঁটের পাশে সেই আস্তরণে ফাটল ধরে — সে হাসি পৈশাচিক, অথচ দেবীর মতো পূজ্য। সীসা আর ভিনিগার মেশানো সেই মারণ পাউডারই তার সৌন্দর্যের প্রতীক। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সভাসদদের স্ত্রীরা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে; তাদের চোখে রানীর সেই ফ্যাকাশে মুখটাই যেন আলোর উৎস। কেউ ফিসফিস করে বলে, 'রানি যেমন, আমরাও তেমন।' আর পরের দিন থেকেই, রাজ্যের প্রতিটি নারী নিজের মুখে মেখে নেয় সেই সাদা মৃত্যু—যেন বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়ই হল 'রানীর মতো হয়ে ওঠা।'

তারপর বহু শতাব্দী কেটে গেছে। রানী এলিজাবেথ ১ তাঁর সৌন্দর্যের এই ভয়ানক সংজ্ঞার ফল স্বরূপই গত হয়েছিলেন, সাথে মৃত্যুবরণ করেছিল তার হাজার হাজার অনুসরণকারীও। তবুও কেউ বলতে সাহস করেনি, 'রানী এ সৌন্দর্য নয়, এ বিষ।' সেখানে মতের বিনিময়ে শাস্তি ছিল, প্রশ্নের বিনিময়ে ছিল নির্বাসন। তাই সবাই নত হয়ে, নীরবে, অনুকরণে মগ্ন। সমাজ পরিবর্তনশীল, মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, তাই রানীর মৃত্যু হতেই তারা এই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নাকচ করে পরবর্তী ক্ষমতাশালীর সংজ্ঞা মেনে নিল। এখন নতুন নিয়ম, নতুন মুখ, নতুন ভয়। কখনো সেটা ধর্মের, কখনো রাষ্ট্রের, কখনো সমাজের। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন স্তরে কিন্তু প্রতিনিয়ত একই জিনিস হয়ে চলেছে; প্রেক্ষাপট আলাদা, কিন্তু প্রথাটা একই। একেই হয়ত পোশাকি ভাষায় 'থ্রেট কালচার' বলে। ভয় এখন আর চাবুক হাতে আসে না, আসে নরম কথায়, 'এইভাবে করাই ভাল' জাতীয় পরামর্শ। যেমন ধরুন ছোট থেকে হাজার প্রশ্ন করে আসা ছেলেটি বা মেয়েটি যখন প্রথম কর্মক্ষেত্রে পদার্পন করে, তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে বসকে প্রশ্ন করতে নেই। সে যা চাইছে চুপটি করে সেটাই করে যেতে হবে। আবার সেই ছেলেটি বা মেয়েটিই হয়ত সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো একটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল আর সেই রাতেই তার কাছে অজানা নম্বর থেকে একটি ফোন আসে, তার পরিবারকে

ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে তাকে সেই পোস্টটি তুলে নিতে বলা হয়। 'থ্রেট কালচার' শব্দটি আমরা একটি বড়ো সামাজিক স্তরে ব্যবহার করে থাকি বটে কিন্তু নিজের চারপাশে তাকালেই আকছারই থ্রেট কালচার দেখা যায়। এই যে মার খাওয়ার ভয়ে কম নম্বর পাওয়া পরীক্ষার খাতা আলমারিতে জামার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে হয়, সেটাও কিন্তু 'শাসন' করার নামে কে ধরনের থ্রেট কালচার।

ছোটবেলায় জীবনবিজ্ঞানে আমরা একটা জিনিস পড়তাম, নার্ভাস সিস্টেমের 'ফাইট অর ফ্লাইট রিঅ্যাকশন'। প্রতিকূল অবস্থায় অধিক অ্যাড্রেনালিন হরমোন ক্ষরণ হওয়ায় এটা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক স্টিমুলাই। কিন্তু আজকের দিনের ভয়ঙ্কর সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, আমাদের মানসিক ভারসাম্য যা ফাইট বা ফ্লাইট—এই দুই প্রতিক্রিয়ার মাঝামাঝি কোথাও থাকার কথা ছিল, তা আজ এসে দাঁড়িয়েছে এক অদ্ভুত তৃতীয় অবস্থায়—'ফ্রিজ'। আমরা না লড়ি, না পালাই, আমরা থেমে যাই। থেমে গিয়ে তাকিয়ে দেখি কে কী বলছে, কে কাকে সমর্থন করছে, কোন কথা বলা নিরাপদ। সেই অনুযায়ী তাদেরকে আমরা অনুসরণ করি। যে প্রতিক্রিয়ায় শাস্তি নেই, একঘরে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই, অযথা প্রতিবাদ করার হ্যাপা নেই, আমরা সেই প্রতিক্রিয়াকেই বেছে নিই। আমাদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্তগুলো আর স্বাধীন চেতনার নয়, হয়ে ওঠে ঝুঁকি-ম্যাপিং। কৌতুক করা যাবে কি না, কোন মতামত কোথায় দেওয়া নিরাপদ, কার সঙ্গে কোন বিষয় আলোচনা করলে সমস্যা বাড়বে ইত্যাদি। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হয়; আমরা শৃঙ্খলার নাম করে নিজেরই কণ্ঠকে প্রশিক্ষিত করে ফেলি। থ্রেট কালচার এখন দলীয় রাজনীতির দেয়াল টপকে সমাজের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ মতাদর্শ মানেই পরিচয়, আর পরিচয় মানেই শিবির। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক শিবিরগুলোর আধিপত্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। কেউ যদি বিরোধিতা করে, সেটা শুধু বক্তব্য নয়, এক ধরনের বিপদ। ভোটার, কর্মী বা সাংবাদিক সবাই জানে কখন কোন কথা বলা উচিত, কোন কাজ করা উচিত। বিরোধী মত প্রকাশ করলেই যে ভারী বিপদে পড়তে হয়। ভোটের সময় ভোটারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের ব্যালট-এর ছাপ নির্ধারণ করে দেয় পাড়ার এক 'দাদা'। দাদার কথার খেলাপ হলেই দাদা রাতবিরেতে দলবল নিয়ে বাড়িতে চড়াও হবে। সময়মতো পোলিং এজেন্ট সরিয়ে ফেলা, ভোটপত্রে জালিয়াতি, পৌর স্তরে বা গ্রাম পর্যায়ে সিস্টেম ওনারদের মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করা এসব হয়ে আসছে প্রতিনিয়ত। আমরা এগুলো দেখি, এগুলো জানি কিন্তু ল্যাবের জারে ফ্রিজ হয়ে থাকা অণুজীবদের মতোই নির্বিকার হয়ে থাকে। যেমন অণুজীব ফ্রিজে রাখা হলে তার বৃদ্ধি ও চলাচল থেমে যায়, ঠিক তেমনই আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বাধীনতা থমকে যায় এই ভয়ঙ্কর থ্রেট কালচারের আওতায়।

এই ভয় জিনিসটা বড্ড ছোঁয়াচে। আমরা নিজেরা কিছু পরখ করে দেখার চাইতে অন্য কারোর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ধারণ করি আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে। ভয় পাওয়ানোও খুব সোজা। মানুষ মূলত নির্দিষ্ট কিছু জিনিসেই ভয় পায়, তার মধ্যে প্রধান তিনটি ভয় হচ্ছে—পাপের ভয়, দারিদ্রের ভয় এবং মৃত্যুভয়। ধর্মভীরু মানুষদের যেমন পাপের ভয় দেখিয়ে বাগে আনাটা খুব সহজ। যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না বা ধর্মীয় শক্তির বাইরে, তাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর রাস্তা — দারিদ্রের ভয় অথবা জীবনের সবচেয়ে মৌলিক ভয়—মৃত্যু। চাকরি চলে যাওয়ার হুমকি কিংবা মৃত্যু সংক্রান্ত ভীতি, নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা, পরিবারের ক্ষতি—এইসব ভয়ের ওপর চাপ দিয়ে মানুষকে নানা নিয়মে বাধ্য করা যায়। এই তিনটি ভয়কে কেন্দ্র করেই মূলত রাজনৈতিক দলগুলো অথবা যে কোনো শাসক শাসন করে। এতে ঠিক শাসকদের দোষ দেওয়া যায় না। মানবজাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এটাই বহুদিন ধরে চলে আসছে যে তারা পুরস্কৃত হওয়ার প্রেরণার থেকে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে কাজ করে বেশি। ফার্স্ট হওয়ার উল্লাসের থেকেও ফেল করার ভয়ই কিন্তু আমাদের পরীক্ষার আগে পড়তে বসার প্রধান চালক শক্তি। সাইকোলজির ভাষায় এটাকে বলা হয় লস অ্যাভারশন; মানুষ সম্ভাব্য লাভের চেয়ে সম্ভাব্য ক্ষতির দিকে বেশি মনোযোগ দেয়। মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম নিয়মটিকে হাতিয়ার করেই কিন্তু শোষণ চলে আসছে বহু প্রজন্ম ধরে। এই ক্ষতি এড়ানোর প্রবণতাই মানুষকে থ্রেট কালচারের মতো ভয়ের রাজনীতি দ্বারা অনুশাসিত হতে বাধ্য করে।

তবে ওই যে বলে কোনো কিছুই অতিরিক্ত করা ভাল না। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটাই সেই অতিরিক্ততে এসে পৌঁছেছে। লস অ্যাভারশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ যদি একবার বুঝতে শুরু করে যে শাসক তার ক্ষতি করা

শুরু করেছে, তখন কিন্তু সেই ক্ষতি এড়াতে সে প্রতিবাদ করবেই। এমনটাই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় হয়েছিল বৈকি। ব্রিটিশ শাসনের নির্মম অত্যাচারের ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতেই তো মানুষ বিদ্রোহ করেছিল। শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই একদিন হয়ে উঠতে পারে ক্ষতি এড়ানোর চাবিকাঠি। এই জায়গাতেই ভয় তার বিপরীতে নিজের প্রতিষেধক তৈরি করে। অতিরিক্ত ভয়, অতিরিক্ত দমন একসময় নিজেই নিজের বিরুদ্ধশক্তি জন্ম দেয়। ভয় যত তীব্র হয়, মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদ তত জোরালো হয়ে ওঠে। থ্রেট কালচারের এই চক্র তাই চিরস্থায়ী নয়—এটা একসময়ে এসে ভেঙে পড়বে নিজের ভারেই। হয়ত আপাতত সমাজ নিস্তব্ধ, মানুষ নীরব; কিন্তু নীরবতা কখনও স্থায়ী হয় না। যেই মুহূর্তে মানুষ বুঝতে শুরু করবে যে ভয় দেখিয়ে তাকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তখন তার মধ্যেই ধীরে ধীরে জন্ম নেবে সাহসের বীজ। যে ভয় একসময় মানুষকে নতজানু করেছিল, সেই ভয়ই একদিন তাকে মাথা তুলতে শেখায়। কেউ হয়ত প্রথমে নিঃশব্দে প্রশ্ন তুলবে, কেউ প্রতীকী প্রতিবাদ করবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন না হয় অনিমেষ-মাধবীলতারা গল্পেই সুখে সংসার করুক।

উ মা

# বীণা দাস : আমার ছোটদিদু

## সুব্রতা দাসগুপ্ত

(স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাসকে নিয়ে ফেসবুকিয় তথ্য বিকৃতি দেখে আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এভাবে একজন শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিয়ে সর্বৈব অসত্য কুপ্রচারকে আমরা ধিক্কার জানাই। — স.ম.)

গত বেশ কয়েকবছর ধরে ফেসবুকের পাতায় এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কোনও এক ইতিহাসের অধ্যাপকের একটি কাল্পনিক লেখা ঘোরাফেরা করেছে। সমাজমাধ্যমে এই ধরনের অনেক লেখা ঘোরাফেরা করে, সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া কর্মহীনের পক্ষেই সম্ভব, আপাতত তাই যথাসম্ভব উপেক্ষাই করি। বীণা দাসকে কেন্দ্র করে লেখা এই গল্পটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নি কারণ বীণা দাস আমার ছোটদিদু। আমি নিজে তাঁকে ছোটবেলায় অল্পস্বল্প দেখেছি। তরে চেয়েও বড় কথা আমার মা, এবং অন্যান্য মাসীদের জীবনযাত্রার ওপর ওঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে বুঝেছি, গোটা পরিবারের কাছেই তিনি কতটা শ্রদ্ধার আসন অলংকৃত করে আছেন।

সমাজমাধ্যমে প্রচলিত গল্পের উত্তরটিও সমাজমাধ্যমে, মানে ফেসবুকের জন্যেই লিখেছিলাম। পড়ে অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কেউ কেউ দুঃখিতও হয়েছেন। কিন্তু এতদিন পরে আবার 'উৎস মানুষ' থেকে বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আকারে লেখার অনুরোধ করা হল।

'বিস্তৃত আকারে' কিছু লেখা অবশ্য মুশকিল। কারণ আগেই বলেছি, আমার ছোটদিদুকে আমি দেখেছি মাত্রই কয়েকবার। সেও ছোটবেলায় ওঁদের আনোয়ার শা রোডের সরকারি আবাসনে। আমরা বেশ অনেকে মিলেই সেখানে যেতাম। উনি যে ছোটদের দেখে বিশেষ খুশি হতেন সেটা বুঝতে পারতাম ওখানে গিয়ে। এ ছাড়াও ওঁর সঙ্গে দেখা হত আমার নিজের দিদু, বীণা দাসের সেজদিদি পূণ্যপ্রভা বসু (দাস)-এর বাড়িতে। বড়মাসী ধীরা ধরের বাড়ি ছিল সেন্ট্রাল পার্কে, সেখানেও ওঁরা খুব আসতেন। আমি সেখানেও দেখেছি বেশ কয়েকবার। সেন্ট্রাল পার্কে বড়মাসীর বাড়ি আসতেন আরেকজনও। কল্যাণী ভট্টাচার্য—বীণা দাসের ছুটু দিদি—ছাত্রী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, এবং অক্লান্ত সমাজসেবী। বীণা, কল্যাণী, পূণ্যপ্রভাদের মায়ের স্মৃতিতে সরলা পুণ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও কত ধরনের সমাজসেবামূলক কাজে যে কল্যাণী ভট্টাচার্য অর্থ, শ্রম ও নেতৃত্ব দিয়ে অংশ নিয়েছেন তারও কোনও যথাযথ ডকুমেন্টেশন হয় নি। কল্যাণী ভট্টাচার্যের স্বামী দিল্লীতে খুবই উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, তাঁর জীবনযাত্রা, পোশাক-আশাক বা আদব-কায়দার মধ্যে এক ধরনের পারিপাট্য ছিল। কিন্তু কল্যাণী ভট্টাচার্য ছিলেন একেবারে বিপরীত। এত আত্মবিস্মৃত কর্মী মানুষ আমি আর দেখি নি বললেই চলে।

আমার মা ইন্দিরা, বড়মাসী ধীরা এবং মেজমাসি ইরা—এঁরা তিনজনেই আবার কল্যাণী ও বীণার বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

কল্যাণী ভট্টাচার্যের লেখা 'জীবন অধ্যয়ন' বইটিতে পাওয়া যাচ্ছে ধীরা তাঁর মাসির সঙ্গে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রামে চলে যাচ্ছেন সমাজসেবার কাজে। পরবর্তী সময়ে বীণা দাসের পরামর্শেই সম্ভবত, এই বোনেরা কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করেছেন। চটকল শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের মধ্যে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি আছে অধ্যাপক শমিতা সেন-এর লেখাতেও। এই ধীরা গত হয়েছেন অল্প কিছুদিন আগে, প্রায় ১০০ বছর বয়সে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ থেকে শুরু করে সুনীল গাঙ্গুলী পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের লেখার অনুবাদ করে গিয়েছেন শুধুমাত্র বাংলার বাইরে বা দেশের বাইরে বড় হওয়া বঙ্গসন্তানদের জন্য, যারা কোনও না কোনও কারণে বাংলা ভাষায় সাহিত্যের রসাস্বাদনে সক্ষম হয়ে ওঠে নি।

এই লেখা বীণা দাসের জন্যই। কিন্তু আগেই বললাম বীণা দাসকে আমি চিনেছি শৈশবের চোখে, সেই চেনা সমৃদ্ধ ও পূর্ণতর হয়ে উঠেছে যাঁদের সংযোগে তাঁরা হলেন —ধীরা, ইরা, ইন্দিরা প্রভৃতি আমার মা মাসীরা। তাঁরা নিজেরাই যথেষ্ট সমীহ-সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন কিন্তু বীণা দাসের প্রতি তাঁদের যে আনুগত্য, সম্ভ্রম এবং অনুরাগ দেখেছি, তা থেকে বীণা দাসের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্ব আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দিদি কল্যাণীর মতো একদমই আলুথালু প্রকৃতির ছিলেন না ছোটদিদু। তিনি দীর্ঘাঙ্গী, অত্যন্ত সুন্দরী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন। আমরা ছোটরা তাঁর কাছে প্রবল প্রশ্রয় পেলেও নিজের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বড়দের নানা পরামর্শ বা অনুযোগকে তিনি এমন তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতেন যে, তা দ্বিতীয়বার বলার সাহস কারও হত না। তিনি যা করবেন না, সেটা তাঁকে দিয়ে করানো অথবা তিনি যা করবেন মনস্থির করেছেন সেটা থেকে তাঁকে নিরস্ত করা, দুইই অসম্ভব ছিল।

কল্যাণী ভট্টাচার্য নিজের ছোটবোন সম্পর্কে কিছু স্মৃতিচারণা করেছেন। প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায় তার থেকে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি —বীণা দাস সেই বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন। পরিবারের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কল্যাণীও ছিলেন। ওঁদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন এক বিধবা মামী এবং তাঁর একমাত্র মেয়ে অনু। সম্ভবত সেও সেই বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিল বীণার সঙ্গেই। স্নান করার সময় নুলিয়ার সঙ্গে অনু এবং বীণা সমুদ্রের অনেক ভিতরে চলে গিয়েছিলেন। একটা সময় মনে হয়েছিল, তাঁরা বুঝি ফিরতে পারবেন না। নুলিয়াও ওঁদের দুজনকে নিয়ে ফিরতে পারছিলেন না। বীণা তখন নুলিয়ার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে বলেছিলেন, দুজনকে বাঁচানো সম্ভব নয়। যদি একজন বাঁচে তা হলে ওই বাঁচুক। ওকে নিয়ে তীরে চলে যাও। বীণা এরপর ভেসেই যাচ্ছিলেন, ফেরা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এইসময় অন্য নুলিয়ারা দেখতে পেয়ে বীণাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

আরেকটি জায়গায় কল্যাণী লিখছেন--- স্ট্যানলি জ্যাকসনের ওপর গুলি চালানোর পর বীণার সঙ্গে তাঁর বাবা বেণীমাধব দাস ও মা সরলা দাস-এর দেখা করানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'দেখুন আপনার ধরা পড়ার খবরে আপনার বাবা মায়ের কী অবস্থা হয়েছে। আপনি শুধু বলে দিন এই রিভলভার আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন, আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব।' বীণা নাকি একটু হেসে বলেছিলেন, 'আমার বাবা এমন শিক্ষা দেন নি আমায় যাতে আমি বিশ্বাসঘাতকের কাজ করব।' এরপর বীণাকে নানা ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে পুলিশি হেফাজতে। ফাঁসির ভয় তো ছিলই। কিন্তু কোনও ভয় বা প্রলোভনেই তিনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য এতটুকু অমর্যাদার কাজ করতে রাজি হন নি। তখনও না। পরবর্তী সময়েও না। এইজন্যই বীণা দাস তাঁর পেনশনের জন্য ডি আই-এর কাছে কাকুতিমিনতি করছেন এই দৃশ্যটি এত করুণার সঞ্চার করে—বীণা দাসের প্রতি নয়, ওই গল্পলেখকের প্রতি। কারণ বীণা দাসের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বা প্রতিবেশীরা, যাঁদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তাঁরা কেউই বীণা দাসের অর্থাভাবের কথা কখনও বলেন নি বা লেখেন নি। বরং সরকারি আর্থিক অনুদানগুলি তিনি এড়িয়ে চলতেন বলেই আমরা জানি। ১৯৬০ সালে সমাজসেবার জন্য তিনি পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন।

বীণা দাসের শেষ জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা এইরকম। ১৯৮৬ সালে ১৯ নভেম্বর রাত্রে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামী, সরকারি কলেজের অধ্যাপক জ্যোতিষ ভৌমিক মারা যান। বীণা দাসের প্রতিবেশী কল্পনা দাস বলেছেন, এই সময় তাঁদের শুভানুধ্যায়ীরা খুব বেশি বেশি ওঁর কাছে আসতে থাকেন। কিন্তু এই ধরনের সহানুভূতিসিক্ত জীবন বীণার সহ্য হচ্ছিল না। তিনি বারবারই এ সময়ে বলেছেন, তাঁকে একটু একা থাকতে দেওয়া হোক। বলেছেন, তিনি বাইরে কোথাও চলে যেতে চান। আত্মীয়বন্ধুরা প্রতিবেশীরা সকলেই আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু, ওঁর ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং 'অগ্নিকন্যা-বীণা' হিসেবে তাঁর যে গরিমা ও মানসিক দৃঢ়তা—তার সঙ্গে কেউই যুঝে উঠতে পারেন নি।

ওই বছরে ৩০ নভেম্বর জ্যোতিষ ভৌমিকের স্মরণসভা ছিল। তিনি সে রাতেই দুন এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে রেখেছিলেন বেনারস যাবেন বলে।অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর

বিকেলবেলাই তিনি এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীকে বলেছিলেন, এক্ষুণি হাওড়া স্টেশনে চলে যাওয়া দরকার, নয়ত আবার কেউএসে পড়বে, যাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটবে। এইভাবে তিনি বারাণসী পৌঁছন। সেখানেই কিছুদিন ছিলেন। এই সময়েও তিনি কলকাতায় চিঠি লিখে পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছেন ভাইয়ের ছেলেকে, এমনকি প্রতিবেশীদেরও। প্রয়োজন মতো টাকাও চেয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ১৭ ডিসেম্বরের পর তাঁর আর কোনও চিঠি আসে নি। এমনকি পাঠানো টাকাও ফেরত আসে। তিনি উঠেছিলেন উপবন নামের একটি গেস্ট হাউসে। তারা জানায়, তিনি হৃষিকেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এরপর সকলেই খোঁজ করতে হৃষিকেশে পৌঁছন। সেখানেই পুলিশের কাছ থেকে জানা যায়, ২৫ ডিসেম্বর ওখানকার হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করতে হয়েছিল এবং পরের দিন ২৬ ডিসেম্বর সেখানেই তিনি মারা যান।

এক হিসেবে দেখলে বুদ্ধ থেকে বীণা দাস পর্যন্ত কোনও মহাপুরুষের জীবনই ১০০ শতাংশ সফল নয়। কারণ এই পৃথিবীর কুশ্রীতা, ভীরুতা আর নীচতাকে কেউই তো পারলেন না সম্পূর্ণ দূর করতে। এই ব্যর্থতার ছবিটা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি বীণা দাসকে গরিয়সী মূর্তিতে পূজার বেদিতে স্থাপন করার ছলে কেউ কেউ আসলে তাঁকে অবজ্ঞা করছেন, তাঁর জীবন, তাঁর শিক্ষা, তাঁর বাণী এগুলোকে অস্বীকার করছেন আর তাঁকে পরিণত করেছেন এক করুণার পাত্রে। অগ্নিকন্যা বীণার জীবনদীপের আগুনে এই সমস্ত মিথ্যা প্রচারের চির অবসান হোক, এই কামনা করি। **উমা**

# চিকিৎসার দ্বান্দ্বিকতা

## সুগত দাশগুপ্ত

চিকিৎসাশাস্ত্র একটি বিজ্ঞান হলেও তার গতিপ্রকৃতি একরৈখিক পথে ধাবিত হয় না। বিজ্ঞানের সূত্রাবলীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে অসংখ্য আর্থসাামজিক উপাদান। মমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিশ্রমে 'প্রাণ' বেঁচে গেলেও, পরবর্তীতে 'জীবন'-এর উৎকর্ষ এবং মান কি রকম হবে, সেটি নির্ভর করে বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও ব্যক্তি-মানুষ ভিত্তিক কারণের উপর, যেগুলি চিকিৎসক এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হাসপাতালের চিকিৎসায় 'প্রাণ' বাঁচলেও আমাদের এই বিপুল জনসংখ্যার দেশে বহু রোগীকেই ফিরে যেতে হয় দারিদ্র্য, অপুষ্টি এবং অশিক্ষার 'জীবনে'। অনেকে কর্মক্ষমতার দিক থেকে পূর্ববর্তী দক্ষতায় আর ফিরতে পারেন না। 'প্রাণ' ফিরে পেলেও অনেকের 'জীবন' অবলম্বন-নির্ভর হয়ে যায়। কোনো কোনো ব্যাধির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনেকের জীবনকে কষ্ট এবং অনটনের দিকে ঠেলে দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক, যে চিকিৎসাবিজ্ঞান 'প্রাণ' বাঁচিয়েও যদি এক শ্রেণীর মানুষকে একটি উন্নত মানের কর্মক্ষম 'জীবন' না দিতে পারে, তাহলে চিকিৎসার প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? কিন্তু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে এই দ্বন্দ্বের কোনো সহজ সমাধান নেই। হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে কারোর হাতেই নেই। তাই 'প্রাণ' এবং 'জীবনের' মধ্যে এই নিরন্তর প্রবহমান দ্বন্দ্ব সংকটজনক রোগীদের নিয়ে কাজ করা সংবেদনশীল চিকিৎসককে অনেক সময়েই দীর্ণ করে। এইরকম বিভিন্ন ধরনের দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়েই চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী সত্যের ঘর্ষণ এবং টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়; ব্যাধি এবং নিরাময়ের বাস্তব পরিস্থিতি নির্ভর সংজ্ঞা ও লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে অগ্রসর হতে হয়। অতএব ডায়ালেকটিক্স বা দ্বান্দ্বিকতার আলোকে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যেতেই পারে। ভারতের মতো জনবহুল এবং আর্থসামাজিক অসাম্যের দেশে এই বিশ্লেষণ হয়ত বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

যেহেতু আভিধানিক অর্থের নিরিখে 'কনফ্লিক্ট' বা সংঘাত এবং 'ডায়ালেকটিক্স' বা দ্বন্দ্ব বা দ্বান্দ্বিকতা, এগুলি খুব কাছাকাছি শব্দ, তাই এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটি প্রণিধানযোগ্য। দুটি ক্ষেত্রেই একাধিক পরস্পরবিরোধী শক্তির বিরোধ থাকে, যার সবকটিই হয়ত ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সত্য। কিন্তু ডায়ালেকটিক্স বা দ্বান্দ্বিকতায় এইরকম বিভিন্ন সত্যের জারণ ও মন্থনের মধ্য দিয়ে আরো নতুন নতুন সত্যের জন্ম হয়। অপরদিকে, কনফ্লিক্ট বা সংঘাতের ভিতর অনেক সময়ই স্থবিরতা প্রোথিত হয়ে যায়। তাই দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়ালেকটিক্স-এর মধ্যে যে গতিময়তা এবং নতুন পথের সন্ধান থাকে, কনফ্লিক্ট-এর ক্ষেত্রে সেটি থাকে না। সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই দিশাহীন, দ্বন্দ্ব অনেক বেশি করে দিক নির্দেশকারী। অগ্রগতিই সভ্যতার নিয়ম,

তাই সমাজের যে কোনো জরুরি ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতার প্রাসঙ্গিকতা থেকেই যায়; চিকিৎসাবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়।

চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জটিলতার নিরিখেও দ্বন্দ্বমূলক আলোকপাত হয়ত জরুরি। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী এবং বৃহত্তর সমাজ, সকলেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলি সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকলে, স্বাস্থক্ষেত্রের সার্বিক পরিবেসের উন্নতিসাধন হতে পারে। চিকিৎসককে যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াশীল শক্তির টানাপোড়েনের মধ্যে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করেও সর্বোত্তম প্রচেষ্টা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে যেতে হবে, একইভাবে সমাজকেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তা ও আর্থসামাজিক অনুষঙ্গগুলিকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে চিকিৎসক একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী মাত্র; মানবদেহের গহনে বিস্তৃত সমস্ত সত্যের উদ্ঘাটন তাঁদের নাগালের বাইরে, রোগ-ব্যাধি-নিরাময়ের সমস্ত প্রশ্নের সরল সমাধান করা তাঁদের ক্ষমতার বাইরে। তাই চিকিৎসককে অকারণ ঈশ্বরের কাছাকাছি আসনে বসানোও যেমন অনুচিত, তেমনি সৎ, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল না মিললেই তাঁকে দোষারোপ বা নিগ্রহ করার প্রবণতাও কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। একথা ঠিক যে, কোনো প্রিয়জনের অনভিপ্রেত মৃত্যুর পরে পরিবার এবং প্রিয়জনদের ওপর এতটাই আঘাত আসে, যে মাঝেমাঝে শোকের আক্রোশে পরিণত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সমাজব্যবস্থায় চিকিৎসার মতো অপরিহার্য একটি বৃত্তিকে লালন করে চলতে হলে সকলকেই যুক্তিনির্ভর এবং মানবিক হয়ে পরিস্থিতির বিচার করতে হয়। চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের উৎকর্ষের জন্য দুই তরফেই এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি।

১৯৪৬ সালে ভোর কমিটি লিখিত ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যব্যবস্থার রূপরেখার পথপ্রদর্শক ছিল কিছুটা তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সেমাস্কো মডেল এবং কিছুটা ব্রিটেনের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট মডেল। এই দুই প্রধানত রাষ্ট্রায়ত্ত মডেলে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষও সরকারি পরিষেবার ওপর জোর দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্যাপিটাল বা পুঁজির প্রবেশের সঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ন্যূনতম খরচের বা বিনামূল্যের সরকারি কাঠামো এবং ব্যয়বহুল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি মিশ্র প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে যেভাবে চিকিৎসায় পুঁজির এবং মুনাফার আগ্রাসন বেড়েছে, তাতে স্বাস্থ্য অনেক ক্ষেত্রেই পরিষেবা থেকে পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অনেক সময়েই অত্যন্ত চড়া দামে পরিষেবা কিনতে হচ্ছে বলে খুব স্বাভাবিক নিয়মে রোগী হয়ে গেছে ক্রেতা। এই ব্যবস্থার হাত ধরেই অনিবার্যভাবে এসেছে বিভিন্ন ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক বিধি।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পুঁজির উত্তরোত্তর উন্মেষের মধ্যে সব থেকে বেশি করে দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে পড়েছে 'সেবা' এবং পুঁজির দ্বন্দ্ব। 'সেবা' কথাটি যুগ যুগ ধরে চিকিৎসকদের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সেবা যখনই বিপুল অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়, তখনই রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে একটি সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়। সেবার মানের সঙ্গে যখনই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণের অসামঞ্জস্য ঘটে, তখনই পুঁজিবাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফার প্রবণতাটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এর একটিও মিথ্যা নয়। সেবা যেমন সত্য, পুঁজিও তেমনি সত্য; বর্তমান ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির গুরুত্বও অনস্বীকার্য। চিকিৎসার মান এবং মূল্যের এই দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল সমাজসচেতন চিকিৎসকদেরও নিরন্তর উদ্বিগ্ন করে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের দীর্ঘমেয়াগি ও নির্দিষ্ট কোনো সমাধান যে চিকিৎসকদের হাতে নেই, সেটি সমাজকে বুঝতে হবে। চিকিৎসক ব্যক্তিগত স্তরে দক্ষতা, জ্ঞান, সততা, সহমর্মিতা এবং মূল্যবোধের অনুশীলন করে বৃহত্তর স্বাস্থ্য কাঠামোর মধ্যে একটি ছোট সদর্থক দায়িত্ব পালন করতে পারেন মাত্র। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু চিকিৎসার মান এবং মূল্যের মধ্যে চলা এই চিরকালীন দ্বান্দ্বিকতার ভিতর দিয়ে নতুন নতুন পথের সন্ধানের মূল দায়িত্ব কিন্তু ব্যবস্থা অথবা 'সিস্টেম'-এর পরিকাঠামোগত পদ্ধতি অথবা 'প্রসেস'-এর। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটি সম্ভব নয়। ব্যক্তি অথবা কিছু সমমনোভাবাপন্ন সৎ ব্যক্তির প্রগতিশীল সংগঠন শুধু অভিমত তৈরি করতে পারে, ব্যক্তিগত পরিসরে মূল্যবোধ এবং সততার আদর্শে দীক্ষিত হয়ে চিকিৎসার কাজ করতে পারে, সিস্টেমের কাছে তাদের জনহিতকামী অভিমতকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর আকারে রূপায়নের মূল কারিগর কিন্তু ব্যবস্থা অথবা সিস্টেম, পদ্ধতি অথবা প্রসেস।

আশার বিষয়, মান এবং মূল্য, চিকিৎসার এই দুই উপাদানকে ঘিরেই সমাজের ভিতর সবচেয়ে বেশি দ্বান্দ্বিকতার চর্চা চলে। নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও এটিই সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। তাই এই ডায়ালেকটিক্স থেকেই সর্বস্তরে কিছু 'সিনথেসিস' বা পরিস্রুত সংশ্লেষের পথ বেরিয়ে

এসেছে এবং আসছে। একদিকে যেমন পুঁজি অধ্যুষিত বেসরকারি ক্ষেত্রে রোগী গ্রাহক এবং ক্রেতার সম্মিলিত চেহারা নিয়েছে, অন্যদিকে ভারতের আর্থসামাজিক পরিকাঠামোতে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদকে স্বীকার করেও তাকে কিছুটা মানবিক রূপ দেওয়ার চেষ্টাও পরিস্ফুট হয়েছে। প্রত্যক্ষ ব্যয়ের চাপের হাত থেকে জনসাধারণকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছে, সরকারি স্তরে বিনা অথবা স্বল্প মূল্যের চিকিৎসার মতো কল্যাণকামী প্রকল্প চালু হয়েছে, জীবনদায়ী প্রাথমিক স্তরের ক্রিটিকাল কেয়ার পরিষেবার সম্প্রসারণ ঘটেছে মফস্বলে, নবজাতকদের জন্য সিক নিওন্যাটাল কেয়ার ইউনিটের পরিধি বেড়েছে। সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে ডায়ালিসিস সহ বেশ কিছু রোগ নিরাময় এবং রোগ নির্ণয়ের পরিষেবা স্বল্পমূল্যে বড় শহরের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে, 'হাব অ্যান্ড স্পোক' মডেল এবং টেলিমেডিসিনের সাহায্যে প্রত্যন্ত জায়গাতেও জরুরি পরিষেবা বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালু হয়েছে। আরো অনেক নতুন পথের অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে।

এ কথা উল্লেখ্য, যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা এবং আর্থসামাজিক বৈষম্য এতই বিপুল যে দ্বান্দ্বিকতার চর্চা থেকে জন্ম নেওয়া এই সব মানোন্নয়ন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি এখনো অপর্যাপ্ত। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এদের ব্যবহারিক প্রয়োগে অসামঞ্জস্য আছে, অনিয়ম আছে, শিথিলতা আছে। তাই চিকিৎসার মানের উন্নয়ন এবং মূল্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো জনকল্যাণকর পথের নিরন্তর অনুসন্ধান করে চলতেই হবে রাষ্ট্রকে এবং সিস্টেমকে। চিকিৎসদের যেমন এই সার্বিক ব্যবস্থার অন্দরে এক কর্মী ও কুশীলব হয়ে পরিকাঠামো অনুযায়ী সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে, একইভাবে রোগী, রোগীর পরিজন এবং সমাজকেও বুঝতে হবে যে চিকিৎসক তাদের সামনে স্বাস্থ্য পরিষেবার মুখ হলেও, তাদের মতোই তাঁরাও একটি বৃহত্তর ব্যবস্থা বা সিস্টেমের অংশ মাত্র। বুঝতে হবে, যে ব্যবস্থা বা সিস্টেমের উপরে চিকিৎসার মান, ফল এবং মূল্য অনেকটাই নির্ভর করে, তার বেশির ভাগ উপাদানের উপর চিকিৎসকদের কোনো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক পথ কোনটি সেটি জেনেও, অনেক চিকিৎসক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন না। এই দ্বন্দ্ব কিন্তু সৎ সংবেদনশীল চিকিৎসককে প্রতিনিয়ত আলোড়িত করে।

যে কোনো পেশার মতন কর্তব্যে গাফিলতি হলে চিকিৎসকের শাস্তিও অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ভারতের মতো বৈষম্যের দেশে 'দায়িত্ব' বা 'কর্তব্য' কথাগুলি অসম্ভব রকমের দ্বান্দ্বিক। একজন চিকিৎসকের কাজের পরিকাঠামো ও বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে তাঁর দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনকে বিচার করা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জনজাতির বা সামাজিক পরিকাঠামোর রোগীদের নিয়ে গবেষণা জাত বিবিন্ন বিদেশী গাইডলাইন-এর মানদণ্ডে আমাদের দেশের প্রত্যন্ত গ্রামের চিকিৎসার মানকে বিচার করা সমীচীন নয়। তাই পরিকাঠামো এবং পরিস্থিতি ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন বারবার অনুভূত হচ্ছে। ভারতের মধ্যেই বড় শহরে থাকা এবং সঠিক সময়ে উন্নত হাসপাতালে পৌঁছনো হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা সেপসিসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার মান এবং ফল সেই সব মফস্বল বা গ্রামের রোগীদের থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য, যাদের অসময়ে সংকট দেখা দিলে দূরবর্তী হাসপাতলে নিয়ে যাওয়ার সঠিক অ্যাম্বুলেন্স পেতে অসুবিধে হয়। তাহলে এইসব রোগী যখন নিকটবর্তী ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরিষেবা চাইবেন, তখন সেই চিকিৎসক বাস্তবে কতটা করতে পারেন? খুবই সীমিত নয় কি? প্রাথমিক চিকিৎসার ওপর প্রায় জোর দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পদ্ধতিও যে কঠিন এবং বিশেষ পরিকাঠামো নির্ভর, সেই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে সমাজকে এবং নীতি নির্ধারকদের বুঝতেই হবে। এমতাবস্থায় চিকিৎসক যেহেতু বিজ্ঞান জানেন এবং একই সঙ্গে তার সীমাবদ্ধতাও জানেন, সেহেতু তিনি বারবার দ্বন্দ্বের শিকার হন। এইসব দ্বন্দ্ব থেকে কখনও কখনও আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্থৈর্যের চ্যুতি ঘটতেই পারে, যার প্রভাব চিকিৎসক রোগী সম্পর্কে ওপরে পড়ে। এইভাবে চিকিৎসক আন্তরিক এবং দক্ষ হলেও বাহ্যিক কারণের জন্য অনেক সময় রোগী অথবা তার পরিজনদের সঙ্গে তাঁর পেশাদারি সম্পর্কের ক্ষয় হয়। তাই চিকিৎসক-রোগীর এই সম্পর্ককে আরো বেশি করে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সুদৃঢ় সূত্রে গাঁথতে নিরন্তর উন্নততর পথের অনুসন্ধান প্রয়োজন ডায়লেকটিক্স-এর উপর ভিত্তি করে। সভ্যতা ও চিকিৎসার ইতিহাস প্রমাণ করে, এই নিরন্তর অনুসন্ধান, এই নিরন্তর সংশ্লেষই অগ্রগতির সোপান।

পুঁজিবাদ ভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যেও মূল্যবোধ এবং মানবতার আদর্শে পুঁজিকে একটি মানবিক রূপ দিয়ে মান এবং মূল্যের দ্বন্দ্বকে গঠনমূলক পথে ধাবিত করাই এই ডায়ালেকটিক্সের বৈশিষ্ট্য। তবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজিবাদের মানবিক মুখের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও একথা বলতেই হবে, যে ভারতের জনসংখ্যা এবং আর্থসামাজিক বৈষম্যের পটভূমিতে সরকারি ক্ষেত্রকে উজ্জীবিত রাখতেই হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়ন এবং সর্বাত্মক রক্ষাই চিকিৎসার দ্বান্দ্বিকতা প্রসূত প্রধান মানবিক পথ। বেসরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোর পুঁজিপ্রধান বহিরঙ্গে একটি মানবিক অন্তর প্রতিস্থাপন ও লালন করার জন্য সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উত্তরোত্তর সমান্তরাল বিকাশ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। **উমা**

# খাদ্যসংস্কৃতি

## অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

বিষয়টির আলোচনাকাল তিনটি ভাগে ভাগ করলে, হৃদয়ঙ্গম করতে সুবিধে হতে পারে। বর্তমান, ভবিষ্যত এবং অতীত। যেহেতু আমাদের বেঁচে থাকাটা বর্তমান সময়েই, তাই আলোচনার শুরুটা বর্তমানকাল থেকেই হোক।

**বর্তমান** : কৃষ্টিগতভাবে দেখলে, মানুষের খাদ্যাভ্যাসকে একটি সংস্কৃতি বলাই যায়। হ্যাঁ, অবশ্যই সেই সংস্কৃতি তার পরিচিতির একটি মাধ্যম। সংস্কৃতির উপাদানগুলি কিভাবে একটি গোষ্ঠীর বা আঞ্চলিকতার নির্ণায়ক হয়ে ওঠে, সেই ব্যাপারটি আগে বুঝতে হবে। অন্যান্য সব সংস্কৃতির মতোই খাদ্য সংস্কৃতিও সংগঠিত হয় বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে। আবার এই উপাদানগুলিও প্রভাবিত এবং পরিচালিত হয় বিভিন্ন গোষ্ঠী বা অঞ্চলের জীবনধারা, ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস এবং পরিবেশ দ্বারা। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করা যাক।

ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং কৃষিকাজের ধরণ মানুষের খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত এই তিনটি বিষয় সম্মিলিতভাবে নির্ধারণ করে যে, কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে কী ধরনের খাদ্যশস্য, ফল, সব্জি ফলবে এবং প্রাণীজ খাদ্য সহজলভ্য হবে। এই সহজলভ্য উপাদানই শেষ পর্যন্ত সেই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের প্রধান উপকরণ হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ধান, বাজরা, বিভিন্ন ফল (যেমন, কলা, আম, নারকেল) এবং মশলা উৎপাদনের জন্য আদর্শ। তাই এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্যে ভাত বহুবিধ ফল এবং মশলা ব্যবহার দেখা যায় (যেমন, দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি)। আবার ধরা যাক নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, গ্রীষ্মকালের স্বল্প উষ্ণতা ও শীতকাল কম ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে গম, ভুট্টা, আলু, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি এবং বেরি জাতীয় ফল ভালো জন্মায়। ফলস্বরূপ, রুটি, পাউরুটি এবং গম-ভিত্তিক খাবার হয়ে ওঠে এখানকার প্রধান খাদ্য (যেমন, উত্তর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা)। শুষ্ক বা মরুভূমি অঞ্চল, যেখানে কম বৃষ্টিপাত এবং রুক্ষ জলবায়ু, সেখানে সীমিত ফসল (যেমন, বাজরা, জোয়ার) জন্মায়। সেখানকার মানুষ সাধারণত এই শস্য, শুকনো খাবার এবং প্রাণীজ খাদ্যের উপর বেশি নির্ভরশীল। সমুদ্রের কাছাকাছি উপকূলীয় অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাসে মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য একটি প্রধান স্থান দখল করে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল বা জাপানের খাদ্যে মাছের প্রাধান্য। পাহাড়ি বা উচ্চভূমি অঞ্চলে শীতল আবহাওয়ার কারণে কম ফসল জন্মায়। তাই আলুর মতো কন্দাল ফসল এবং পশুসম্পদ (যেমন, ভেড়া, ছাগল) থেকে প্রাপ্ত মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

বিবর্তনের সারণী বেয়ে মানুষ বসতি তৈরি করল সারা দুনিয়া জুড়ে। আস্তে আস্তে বিভিন্ন রকমারি খাবার এবং খাদ্যাভ্যাস মানুষের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেল। আঞ্চলিক সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল। তার কিঞ্চিদধিক বিন্যাস ঘটল মানুষেরই সৃষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস, ট্যাবু, পরিবহন ব্যবস্থা, রন্ধনপ্রণালী ও কৌশলের দ্বারা। খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস এইভাবেই বোধহয় ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হয়ে উঠল।

**ভবিষ্যৎ** : একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে একটু হলেও সন্দেহ জাগে যে, বিশ্বের সাংস্কৃতিক সীমারেখাগুলি বুঝি আস্তে আস্তে ধূসর হতে শুরু করেছে।

মুক্ত অর্থনীতির উড়ন্ত ধ্বজার তলায় বিশ্ব যেন এক বৃহদাকার গ্রামবিশেষ। যৌথ খামারের অধরা স্বপ্নের মধ্যেও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব এবং অমোঘ উন্নয়নে, গঙ্গা-মিসিসিপি-ভল্গার জলের একত্র সিঞ্চন আর যাযাবরের অধরা স্বপ্ন নয়। পরিবহন এবং গণমাধ্যমের অসীম ক্ষমতা আজ মানুষের মুষ্টিগত। সকালে এ দেশে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে, ডিনারে ইটালিতে পৌঁছে লাসাগ্না খেতে গেলে আর ভূতের রাজার বরের প্রয়োজন নেই। আবার দেখুন, এই কলকাতাতে বসেই গুলাশ বা সুশি খাওয়া যেতে পারে, তার জন্যে হাঙ্গেরি বা জাপান যাওয়ার দরকার নেই। আজকাল খাদ্যাভ্যাস আর আঞ্চলিক সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকছে না। সারা পৃথিবী জুড়েই ধীরে ধীরে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সীমারেখা মুছে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য-সংস্কৃতির এই মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু আনুষঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। একদিকে যেমন ফাস্ট ফুড ও প্রক্রিয়াজাত চটজলদি খাবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে অভাবিত স্বাস্থ্য ও ডায়েট সচেতনতাও বেড়ে চলেছে। মানুষের হাতে এখন বিভিন্ন খাবারের বিকল্প এসে গেছে। ল্যাক্টোজ বদহজমের মানুষেরা ল্যাক্টোজবিহীন খাবার পাচ্ছেন। যাঁদের গম জাতীয় খাবারে অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁদের জন্য গ্লুটেন ফ্রি খাবার হাজির। একজন ডায়াবেটিক মানুষ, তাঁর পছন্দমত ডায়েট চার্ট বানিয়ে নিচ্ছেন। খাদ্যাভ্যাস নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিগন্ত খুলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, নিয়মিত। ফিউশন ফুড মানে এখন মোটেই হাঁসজারু বা বকচ্ছপ নয়, চাইনিজ বিরিয়ানি বা ইটালিয়ান ধোসা আজ রসনা তৃপ্তিকর অতীব বাস্তব।

খাদ্যের বিশ্বায়নে যে জিনিসটি ঘটে চলেছে, তা হল ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক খাবারের গুরুত্ব কমে যাওয়া। চটজলদি মুখরোচক খাবার হাতে-গরম পাওয়া গেলে, কে আর বসে সময় নিয়ে খাবার তৈরির ঝামেলা নেয়? বাজার ধরার জন্য, খাদ্য প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি যে অসাধু উপায় অবলম্বন করছে না, সেই নজরদারি কি খুব স্বচ্ছ? এতে মানুষের স্বাস্থ্য কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিনা, তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। কিন্তু যেটা প্রতীয়মান, তা হল স্থানীয় রন্ধন প্রক্রিয়া, উপকরণ ও পরিবেশন রীতির বিলোপ। এতে আত্মপরিচয় কতটা বিলুপ্ত হবে, সে কথা জোর দিয়ে বলা না গেলেও, আত্মসংস্কৃতির ভাব পরিবর্তন বা বিলুপ্তির পথ যে প্রশস্ত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। তাহলে স্থানীয় খাদ্য সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি করা যেতে পারে? অবশ্যই স্থানীয় খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাসকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে স্বাস্থ্যের যে সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে মানুষকে ওয়াকিবহাল করতে হবে। স্থানীয় খাদ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গেলে, 'ইউনেস্কো হেরিটেজ ফুড' তালিকায় স্থানীয় খাবারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অতঃপর এটা বোঝা গেল যে বিশ্বায়নের ঢেউ-এ অন্যান্য সংস্কৃতির মতোই খাদ্য সংস্কৃতিও তার সাবেকি চেহারা ছেড়ে এক অদ্ভুতুড়ে চেহারা নিতে চলেছে বা নিচ্ছে। সাবেকিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এই যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন, তা মনুষ্য শরীরে কোনওরকম নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কি না, তা বুঝতে গেলে মানুষ এবং তার খাদ্যাভ্যাসের বিবর্তন জানতে হবে। অতএব এবার অতীতে বিচরণ।

**অতীত** : আগে মানে কত আগে? আদি মানবের ৪০-৮০ লক্ষ বছর আগে যখন গরিলা আর শিম্পাঞ্জি ভবিষ্যতের মনুষ্য প্রজাতির জিন বহন করে বিবর্তনের পথ ধরেছে, তখন তাদের খাবার বলতে ছিল, লতা-গুল্ম, ফল আর কন্দ। ৩০-৪০ লক্ষ বছর আগে পাওয়া যাবে অস্ট্রালোপিথেকাস-কে। যাঁরা খেতে শুরু করলেন তৃণজাতীয় খাবার, রসালো উদ্ভিদ এবং নন-ভেজ মানে উদ্ভিদভক্ষণকারী প্রাণীদের। কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, বাপু হে, তুমি এসব মনগড়া কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছ না, তার প্রমাণ কি হে? তারা তো আর তাদের খাদ্যাভ্যাস লিখে রেখে যায় নি। এতসব ব্যাপার বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করেছেন ফসিলের দাঁতের এনামেলের রাসায়নিক পরীক্ষা করে। এরপরের প্যালেওলিথিক যুগে ঘটল এক যুগান্তকারী ঘটনা। ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে, সেই সময়কালে, মানুষ শিকার করতে শিখল।

প্রথমদিকে মৃত প্রাণীর মাংস সংগ্রহ অথবা ছোট প্রাণী শিকার করে তার মাংস খাওয়া শুরু হল। খাদ্যাভ্যাসের এই পরিবর্তন সম্ভবত মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি, আয়তন এবং বিকাশে সাহায্য করেছিল। এর পরেই আনুমানিক ১০-১৫ লক্ষ বছর আগে মানুষ জীব শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম ধাপে পা রাখল আগুনকে বশ করে। আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কিছু মৌলিক পরিবর্তন এল। আগুনে সেঁকা মাংস সহজপাচ্য, অতএব মানুষের অন্ত্রস্থিত জীবাণুরা চরিত্র

বদলে ফেলল। তার অন্ত্রের আয়তন ছোট হল। ঝলসানো মাংস নরম হওয়ার জন্য মানুষের দাঁতের আকার পর্যন্ত ছোট হয়ে গেল। পাচক রসের রাসায়নিক উপাদানের তারতম্য ঘটতে শুরু করল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনটা ঘটেছে প্রায় ১০-১৫ লক্ষ বছর অন্তর। কিন্তু এর পরের বিবর্তন বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সময়টা অপেক্ষাকৃত দ্রুত। আনুমানিক ১২-১৫ হাজার বছর আগে মানুষ পশুকে গৃহপালনের কাজে লাগাতে পারদর্শী হল। তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও খামার গড়ে তুলতে শিখল। পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম অনুসন্ধান করতে করতে, সেটিও একটি শিল্পে পরিণত হল। ফলে যে খাবারের সন্ধানে মানুষকে বনেবাদাড়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হত, তা তখন সহজলভ্য হল, দূর হয়ে গেল নিকট। কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা আরো কমল। কৃষিজ ফসলের উপর নির্ভরতা বাড়ার ফলে খাদ্যে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট-এর মাত্রা বাড়তে লাগল। আঞ্চলিক খাবারের গুরুত্ব বাড়তে লাগল; যেমন, মিশরীয়রা মাছ ধরার কৌশল রপ্ত করার ফলে তাদের খাদ্যতালিকায় মাছ একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হয়ে উঠল। রোমানরা গম, রুটি, শূকরের মাংস, মুরগির মাংস এবং পনিরের পাসাপাশি প্রচুর সবজি ও মোটা শস্য খেত। সমুদ্র উপকূলবর্তীবাসীরা মাছ শিকারে দড় হল।

খাদ্যসারণীতে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল মাত্র ৫০০ বছর আগে। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে চটজলদি বানানো যায় এবং সুস্বাদু—এইরকম খাবরের কদর বাড়তে থাকল। শুরু হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাজার ধরার জন্য। খাবারের প্রস্তুতিতে হারিয়ে গেল ব্যাকরণ। খাদ্য সন্ধানে মানুষের পরিশ্রম আরো কমে গেল। প্রক্রিয়াজাত খাবার পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে পৌঁছে গেল অপর প্রান্তে। খাদ্যের আঞ্চলিকতার সীমারেখা ক্রমশ ধূসর হয়ে এল।

জিনের ওপরে পরিবেশের প্রভাব আজ সর্বজনবিদিত। পরিবেশের পরিবর্তনে জিন তার চরিত্র বদলায়। মানুষের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জিনগত পরিবর্তনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং বিবর্তনমূলক। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে খাদ্যের ধরনের পরিবর্তনে, মানুষের জিনোমেও সেই অনুযায়ী অভিযোজন (Adaptation) ঘটেছে। একে বলা হয় পুষ্টিগত অভিযোজন(Nutritional Adaptation)। কৃষিভিত্তিক ও গৃহপালনের আগে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হচ্ছিল কয়েক লক্ষ বছরের তফাতে। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সময়ক্রম নেমে আসে হাজার বছর বা কয়েকশো বছরে। আগে মানুষের জিন যতটা সময় পাচ্ছিল বিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে, এখন ততটা সময় পাচ্ছে কই? উদাহরণ দেওয়া যাক। সাধারণত স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহে ল্যাকটেজ এনজাইমটি শৈশবে দুধ হজম করতে সাহায্য করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর উৎপাদন কমে যায়। কিন্তু বিবর্তনের হাত ধরে মূলত দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীগুলিতে (যেমন ইউরোপের কিছু অংশ এবং পশ্চিম এশিয়ার কিছু যাযাবর সম্প্রদায়) এক ধরনের জিনগত পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে LCT (Lactase) নামক জিনটি (যা ল্যাকটেজ এনজাইম তৈরি করে) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও তাদের দেহে যথেষ্টই সক্রিয় থাকে। কিন্তু গৃহপালিত পশুর দুধ হজম করার জন্য, এই স্বল্প সময়ে, পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে এই জিন সমানভাবে প্রকাশ পায় নি—যেমন পূর্ব এশিয়া বা আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ ইউরোপের কিছু জনজাতি। দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খেলে এই সব অঞ্চলের মানুষদের দুধ হজমের সমস্যা (Lactose Intolerance) হতে পারে। অনুরূপে জিনগত অভিযোজনে শ্বেতসার বা স্টার্চ হজম করার জন্য AMY (Amylase) নামক জিনের কপির তারতম্য ঘটেছে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে। আমরা যদি চর্বি বা ফ্যাট জাতীয় খাবার পরিপাকের কথা ভাবি, সেখানেও FADS (Fatty acid desaturase) জিনের তারতম্য ঘটেছে সারা পৃথিবীর বিশেষ কিছু অঞ্চলের মানুষের মধ্যে। মানুষের বিবর্তনের আদিতে, তার শরীর এবং জিন যতটা সময় পেয়েছে খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার, পরবর্তীতে খাদ্যাভ্যাসের দ্রুত লয়ের সঙ্গে তারা তাল মেলাতে পারে নি। ফলে অন্তস্থ জিনগত পরিবর্তনটি সার্বিকরূপ নেয় নি। যার জন্য যাঁদের শরীরে LCT জিনটি অলস, তাঁরা শখ করে দুধ খেলে পেটের সমস্যা দেখা দেবে।

মানুষের বিবর্তন এবং খাদ্যাভ্যাস এই দুই-এ হাত মিলিয়ে মানুষের শরীরে আরেক ব্যারামের জন্ম দেয়—সেটি হল খাবারের অ্যালার্জি। খাদ্য অ্যালার্জিকে মানুষের বিবর্তনের একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বললে বোধহয় সেটা অতিকথন হবে না। পরিবেশের আবহে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের শরীর বিভিন্নভাবে 'প্রোগ্রাম করা' থাকে। তাই পরজীবীদের ক্রমাগত

আক্রমণকে আমরা বহুলাংশেই প্রতিহত করতে পারি।

বর্তমানে ঝাঁ চকচকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সেই পরজীবীদের আক্রমণ হুমকি কমে এসেছে ঠিকই। কিন্তু অব্যবহারে সেই শক্তিশালী শারীরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মাঝেমাঝে ভুল করে নিরীহ খাদ্য প্রোটিনকে (যেমন চীনাবাদাম, দুধ বা গ্লুটেন) শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে সুরু করে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবান্তর অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটিরই পোশাকি নাম ফুড অ্যালার্জি। আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে এই 'বিবর্তনীয় অমিল' (evolutionary mismatch)ই খাদ্য অ্যালার্জির প্রবণতা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

এই আলোচনায় এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পৃথিবীর খাদ্যসংস্কৃতি সামগ্রিকভাবেই খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের তুমুল ভরবেগে, সংস্কৃতি আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে, তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। খাদ্যাভ্যাসও এর ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু এই পরিবর্তন মানুষের শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, সেটা বুঝতে আরও বিস্তৃত সময় দরকার। কারণ, বিবর্তন-বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে যে খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। খুব দ্রুত সেই পরিবর্তন ঘটলে, মানুষের শরীরে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তেই পারে। কিছু ক্ষেত্রে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণও রয়েছে। মানুষের জিনের গঠন যেভাবে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্টাতে থাকবে, তার ওপরেই হয়ত তার উত্তরপুরুষের সুস্থতা এবং বেঁচে থাকা নির্ভর করবে।

উমা

# কৃত্রিম বৃষ্টি

## অঞ্জন কুমার সেনশর্মা

গত ২৮ অক্টোবর দিল্লী প্রশাসন বায়ুদূষণ কমানোর আশায় কানপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সহযোগিতায় কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটানোর চেষ্টা করেছিল। ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেঘে বীজ বপনের জন্য ছিল দুটো ছোট প্লেন বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর উড়ে Silver Iodide ও সাধারণ নুন বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে নয়ডা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ০.৩ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল। নিউ দিল্লীর ওপরের মেঘে যথেষ্ট আর্দ্রতা ছিল না যাতে করে বৃষ্টি ঘটানো যায়। দিল্লিতে এর আগেও কৃত্রিম বৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। বহু আগে ১৯৫৭ সালে জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি (NPL)-এ বৃষ্টি ও মেঘ বিজ্ঞান গবেষণা দল তৈরি হয়েছিল মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য।

ভারতে এই প্রক্রিয়া প্রথম ব্যবহার করা হয় যখন ১৯৫১ সালে টাটা গোষ্ঠীর সংস্থাগুলো পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার ওপর কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটাতে চেষ্টা করেন ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত Silver Iodide তৈরির যন্ত্র ব্যবহার করে। এক বছর পরে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল এস. কে. ব্যানার্জী পরীক্ষা করেন মাটি থেকে হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুনে করে মেঘে নুন এবং Silver Iodide ছড়ানোর চেষ্টা করে।

পরবর্তী সময়ে এ ধরনের পরীক্ষা দিল্লী ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চালিয়েছিল বৃষ্টি ও মেঘ বিজ্ঞান গবেষণা শাখা যা NPL-এ ১৯৫৫ সালে গঠিত হয়েছিল এবং পরে ১৯৬৭ সালে উষ্ণ বলয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান সংগঠনে (Institute of Tropical Meteorology) হস্তান্তর করা হয়। এই পরীক্ষাগুলি ১৯৫৭র টি সহ, কোনো গবেষণার জন্য করা হয় নি কারণ মেঘে 'বীজ' বপন করার পদ্ধতির ওপর বিজ্ঞানী মহলে বিশ্বাস খুব প্রবল ছিল না। এই পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল সাধারণত কোনো এক আগ্রহীর প্রয়োজনে। উদাহরণ স্বরূপ, কর্ণাটক বিজ্ঞানীদের বলেছিল খরা মোকাবিলায় এই পরীক্ষা চালাতে, বা অন্ধ্রপ্রদেশ চাইছিল চাষিদের আরও জল দিতে।

দিল্লীর ওপর প্রথম মেঘে 'বীজ' ছড়ানোর পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৯৫৭ সালের বর্ষার মাসে —জুন আর সেপ্টেম্বরে কারণ সাধারণত এই পদ্ধতি কাজ করে যখন মেঘে অন্তত ৫০% আর্দ্রতা থাকে।

কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটাতে Silver Iodide আর Sodium Chloride জাতীয় লবণ আবহাওয়াতে ছড়িয়ে দেয়া হয় যাতে সেই অতিরিক্ত 'বীজ'গুলোর চারদিকে মেঘ বিন্দু জন্মাতে পারে।

১৯৫৭ সালের পরীক্ষার আগে বৃষ্টি ও মেঘ পদার্থ বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকেরা ওই অঞ্চলের ওপর সংশ্লিষ্ট আবহাওয়ার গঠন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন

এটা নিশ্চিত করতে যে পরিস্থিতি পরীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন স্বাভাবিক জল আকর্ষক কেন্দ্রের ঘনত্ব, সেই বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম ধুলো বা সামুদ্রিক লবণের, যারা জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করে এবং যারা বাতাসে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মেঘ ও বৃষ্টি তৈরি করতে সাহায্য করে।

বর্তমানে যখন মেঘে 'বীজ' ছড়ানো এরোপ্লেন দিয়ে করানো হয়, ১৯৫৭ সালে বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের কণাগুলো ছড়িয়ে দেবার জন্য জমির ওপর বসানো যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণ এটি বেশি সরল ও এরোপ্লেন ব্যবহারের থেকে অনেক সাশ্রয় হয়।

কৃত্রিমভাবে মেঘ তৈরি সম্ভব নয়। মেঘ থাকলে তবেই তা থেকে বৃষ্টি করানোর চেষ্টা করা যায়। সেটা করতে মেঘের মধ্যে কিছু কণা ঢুকিয়ে দিতে হবে যার ওপর জলের ছোট ছোট ফোঁটা জমবে। এই কণাগুলো প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে মেঘের একটা নির্দিষ্ট গভীরে ছেড়ে দেয়া যায় বা মাটি থেকে এই কণাগুলো খুব জোরে ওপরে ছড়িয়ে দেয়া যায় ঠিক যেমন করে বাগানে জল দেয়া হয়।

১৯৫৭ সালের পরীক্ষার জন্য দুটো স্প্রে করার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। স্প্রে করার যন্ত্র দুটি একই সঙ্গে দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চালানো হয়েছিল নুনের তরল মিশ্রণ ছড়িয়ে দেবার জন্য। বৃষ্টি ও মেঘ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের বর্ষার মাসগুলোতে এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। যদিও কোনো কোনো সময়ে বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এই পরীক্ষাগুলোর কার্যকারিতা কঠোরভাবে নির্ধারণ করা যায় নি কারণ বছরে বছরে ফলের বিশাল ফারাক। পদ্ধতিগুলো কঠোরভাবে পরীক্ষা করা সহজ নয়।

১৯৫৭ সালের পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বহু বর্ষা ঋতুতে এই পরীক্ষাগুলো চালানো দরকার। মেঘ রয়েছে অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না অর্থাৎ মেঘে জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করার মতো কণা, যাকে 'বীজ' বলা হয় তার অভাব এই অবস্থায় মেঘের মধ্যে বীজ ছড়াতে পারলে তাকে কেন্দ্র করে জলের কণা তৈরি হবে এবং সেগুলো বাড়তে বাড়তে ঝরে পরবার মতো আয়তন পাবে।

মেঘের মধ্যে 'বীজ' ছড়ানো সাধারণভাবে নিরাপদ বিবেচনা করে কয়েক দশক ধরে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ার সাফল্যের কারণে এর ব্যবহার উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই পরিবেশের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব চিন্তার বিষয় হয়েছে।

মেঘে 'বীজ' ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রধান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত। Silver Iodide সামান্য পরিমাণেও শরীরে জমে গেলে চামড়া ও দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ ব্যাপারে বিপদসীমাও নির্দেশ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পরিবেশের ওপর। অতিরিক্ত Silver Iodide জল ও জমি দূষিত করতে পারে। কৃষির ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

তৃতীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আবহাওয়ার ওপর। এক অঞ্চলের কৃত্রিম বৃষ্টি অন্যত্র বৃষ্টি কমিয়ে দিতে পারে।

চতুর্থ সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া — অকস্মাৎ ভারী বৃষ্টি ভঙ্গুর ভূখণ্ডে বন্যা, ভূমিধ্বস ঘটাতে পারে।

পঞ্চম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া — বৃষ্টিপাতের পরিবর্তিত বিন্যাস প্রতিবেশী রাজ্য বা দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।

ষষ্ঠ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া — বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠনের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

সম্প্রতি উচ্চ শক্তি লেজার রশ্মি দিয়ে বজ্র মেঘ তৈরি করা হয়েছে যা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দাবী করা হচ্ছে স্বাভাবিক বজ্রপাতের মতো এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। **উমা**

## বিশেষ ঘোষণা

**পত্রিকা ছাপার খরচ ও ডাক খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কলকাতার বাইরের গ্রাহকদের ডাকখরচ কিছুটা বাড়াতে আমরা বাধ্য হলাম। কলকাতার গ্রাহক চাঁদা ২৫০.০০ টাকাই থাকছে। কলকাতার বাইরে স্পিড পোস্টে পাঠানোর খরচ যেহেতু বেড়ে গেছে, সেজন্য তাঁদের ৩০০.০০ টাকা গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে হবে। আমরা অপারগ। গ্রাহকদের সহযোগিতা পাবার আশা করি।**

# মিসিং ডোজ

## গৌতম মিস্ত্রী

সকাল থেকে রাত অবধি ওষুধে মোড়া আধুনিক মানুষ। নাওয়া-খাওয়া, স্নান করা, দাঁত মাজা, কর্তার অফিস কাছারির কাজ আর গিন্নির সংসার ধর্মের আবশ্যিক কাজের মাঝে ওষুধ খাওয়ার ঝক্কি আমরা বেশ মেনে নিয়েছি। পেটের খিদের খাবারে তবু আপোস করা যায়, ওষুধে যায় কী? কোনোটা খাওয়া ঘুম থেকে উঠেই বিছানায় বসে, কোনো টিফিন খাবার আগে, কোনো টা আবার দুপুরে খাবার মাঝে—মানে অর্ধেক ভাত খাবার পরে। গোলাপি কৌটোর হার্টের বড়িটা ঠিক বিকেল পাঁচটায়। রাতে খেতে বসে কিছুটা খাবার পরে মনে হল—'এই যা! খাবার আগের ওষুধটা খাওয়া হয়নি। এটা তো সকালেও খাবার কথা, খেয়েছি কী? বেঁচে থাকার জন্য ওষুধ, না কেবল ওষুধ খাবার জন্যই বেঁচে থাকা। কেবল ঘুমের সময়টা বাদ দিয়ে সব সময় মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে, সতেরোটা ওষুধ ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে খেয়ে তবেই নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমোতে যাওয়া। কেবল ঘুমের ওষুধে ঘুম আসবে না।

গতবার ডাক্তার বললেন, যে ওষুধটা দিনে দুবার খেতে হবে, সেটা নাকি আমি একবার করে খাচ্ছি। ওষুধ খাবার নিয়ম প্রেসক্রিপশনে সাংকেতিক ভাষায় লেখা। প্রেসক্রিপশনে ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম ঠিকই লেখা থাকে, সেই সংকেতের মর্মোদ্ধার করা বা 'ডিকোড' (decode) করেন ওষুধের দোকানের ক্লাস এইট ফেল করা, কিন্তু অভিজ্ঞ ষাট বছরের সেলসম্যান হারু। হারু, ফাইনাল ডাক্তার, বিক্রি করা ওষুধের খামের উপরে গোল চিহ্ন আর ড্যাশ দিয়ে ওষুধ খাবার ফাইনাল নিদান দিয়ে দেন। প্রতিদিন বিভিন্ন খামের ওষুধগুলো বের করে আবার সঠিক খামে ভরা মোটেই সহজ নয়। ওষুধ ভরা কাগজের খাম না ছিঁড়ে তাকে এক মাস লালন করাও একটা শিল্প। গোল চিহ্ন, ড্যাশ আর ওষুধের খাম বদলে যাবার চক্করে ডাক্তারের নিদানের সঙ্গে ওষুধের ব্যবহারের সঙ্গত হয় না অনেক সময়ে।

অর্থবান প্রবীণ নাগরিকদের বার্ধক্য বিলাসবহুল। হাঁটুর ব্যথায় খোঁড়া, চোখে কম দেখা কানা, কানে কম শোনা বয়রা—ইত্যাদি বেয়াদপ বিশেষেণে ভূষিত সচ্ছল প্রবীণ ও টিকে থাকা নাগরিকরা হুইলচেয়ার, কৃত্রিম শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে আজ সজ্জিত। প্রতিবন্ধী সহায়ক ও সমর্থিত বিশ্ব একটি অধিকার বললে সঠিক হয়, কিন্তু সবটা বলা হয় না। অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম, হুইল চেয়ারে বসে থাকা বুড়োবুড়িদের হাতে বিশ্বের প্রায় সমস্ত সম্পদের অধিকার। ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা ও চিকিৎসা পরিষেবা সচেতনে সেইভাবে নিজেদের ভোল বদল করে নেয়। তাই অনন্তকাল খেতে হবে এমন ওষুধের পাতায় আজকাল লেখা থাকে সানডে, মানডে, টুইসডে ইত্যাদি; অথর্ব এলিট নির্বান্ধব বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা মাথায় রেখে। জনগণের মঙ্গলার্থে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মুখোশে আজকাল পাওয়া যায় সস্তা জনগণের ঔষধ। সেই ওষুধ অবশ্যই ন্যায্য মূল্যের। ৭০ শতাংশ অবধি ছাড় দিয়েই সস্তা ও সুন্দর সেই ওষুধ ন্যায্য তকমা পায়। নিরক্ষর সংখ্যাগুরু মানুষজনের জন্য প্রস্তুত ন্যায্য, সস্তা ও সুন্দর ওষুধের পাতায় ওষুধে অকিঞ্চিৎকর সোম, মঙ্গল ইত্যাদির ট্যাগলাইন অনেক সময়ে থাকে না।

আপনি বৃহস্পতিবারে উপোস করবেন এই তত্ত্ব ওষুধের কোম্পানি জানলেও সেটা মেনে ওষুধের পাতায় বৃহস্পতিবারের উল্লেখ না করে পারে না। আপনি বৃহস্পতিবারে উপোস করলে ওষুধ খাবেন কী খাবেন না, সেই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে ওষুধের কোম্পানি নিজেকে গুটিয়ে নেয়। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে এক এক সময়ে এক এক উত্তর দেন। সুগারের রোগী একদিন উপোস করলে ও ওষুধ না খেলে কি হবে সেই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিতভাবে ডাক্তারের জানার কথা নয়।

আমরা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করি। কিছু ওষুধ জল দিয়ে গিলে খাই, কিছু বা চুষে খাই, কিছু জিভের তলায় রাখি। এগুলো মুখ দিয়ে আমাদের শরীরে ঢোকে। মলম ওষুধ চামড়ায় লাগাই। চোখে, কানে আর নাকে ওষুধের ফোঁটা দিই। ফুসফুসে ওষুধ স্প্রে করি। ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে ওঠা কিছু ওষুধ কাজের, কিছু অকাজের। অকাজের ওষুধ বাদ গেলে ক্ষতি নেই, কাজের ওষুধ ভুল করে বাদ পড়ে গেলে কী করা সেটাই আলোচ্য।

অকাজের ওষুধ খেলেও হয়, না খেলেও হয়। ভুল করে একবারের জায়গায় দুই তিনবার খেলেও তাই। এমন ওষুধের তালিকা লম্বা — বার্ধক্যের অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় দুর্বলতার জন্য এ থেকে জেড অবধি শক্তিবর্ধক দামী ভিটামিনের

পেটেন্ট ক্যাপসুল, হরলিক্স, কমপ্লান, এন্সিওর ইত্যাদি। অকাজের ওষুধের মিসিং ডোজ আদতে যত হয় ততই মঙ্গল।

রক্তচাপের বা সুগারের রোগের চিকিৎসা, হার্ট অ্যাটাকের পরের আবশ্যিক চিকিৎসা, হার্টের বাইপাস বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির পরের চিকিৎসা ইত্যাদিতে আমরণ নিয়মিত ওষুধ ব্যবহারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থাকে। আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ধাক্কা খাওয়ার পরে এক নিমেষে হিরো থেকে জিরো বনে যাওয়া, টিকে থাকা, খাবি খাওয়া মানুষ বাধ্য হয়ে ওষুধ খাওয়া ঝক্কি মেনে নেন। ঝক্কি মেনে নিলেও বেখেয়ালে ওষুধ খেতে ভুল হয়ে যায়।

ওষুধ খাওয়ার ভুল বা ভুল ওষুধ খাওয়ার তিন ধরনের সমস্যা ঃ (১) ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া, (২) ওষুধ খেয়েছি কী সেটা ভুলে যাওয়া ও (৩) ওষুধটা পাড়ার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ওষুধ খাই নি। শেষ অবস্থা, ওষুধ না পাওয়ার সমস্যা মোটেই বিরল নয়। তবে এটা কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় নয়—অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ও বটে। ধার-বাকিতে পাড়ার দোকানদার ওষুধ দেন। তার দোকানে না থাকলে অন্য দোকানে ওষুধ থাকা, না-থাকার সমান অনেকের কাছে।

ওষুধ খেতে ভুলে গেছেন, খেয়েছেন কী খান নি কিনা এই ধন্দ নেই, সে ক্ষেত্রে সাধারণত এটাই চিকিৎসকদের নিদান এই যে, যখনই মনে পড়বে, তখনই ওষুধ খেয়ে নিন, যদি না ওষুধের পরবর্তী ডোজ সন্নিকটে। পরের ডোজের কাছাকাছি গিয়ে মনে পড়লে, ভুলে যাওয়া ওষুধের ডোজ না নিয়ে পরের ডোজ থেকে ওষুধ খাওয়া সমীচীন। প্রেশারের, সুগারের, হার্টের রোগের, থাইরয়েডের রোগের আবশ্যিক ওষুধের ডোজ ভুলে যাওয়ার জন্য একই নিয়ম।

নিয়ম থাকলে নিয়মের বাইরের কথা বলাও নিয়ম। নইলে নিয়ম একপেশে দোষে দুষ্ট হয়। 'এক্সেপ্সন অব দ্যা রুল' ওষুধের বেলায়ও আছে। গর্ভনিরোধক বড়ি একদিন বেমালুম ভুলে গেলেও পরের দিনের বড়ির সঙ্গে আগের দিনের না খাওয়া ওষুধ খাবার নিয়ম। একইভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'খেয়েছি কী খাই নি' এই দোলাচলে বেশি ওষুধ ব্যবহারে লাভ কতটা জানা নেই, ক্ষতি নেই মোটেই। অর্থাৎ এই ধরনের ওষুধের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া ওষুধ পরবর্তী ডোজের ঘাড়ে চাপালে ক্ষতি নেই। যেমন কৃত্রিম চোখের জলের ফোঁটা, দাদের মলম, আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন, বার্ধক্যে যৌবনের তেজ বর্ধকের মিথ্যে মিথের দামি পেটেন্ট ওষুধ। ভিটামিন 'ডি' শ্রেণীর ভিটামিনের নিয়ম আলাদা, এমন একটি ভিটামিন যেটা বেশি খেলেও সমস্যা। ভিটামিন হলেও ভিটামিন 'ডি' খেয়েছেন না খান নি এটা ভুলে গেলে ধরে নিন ওটা খেয়েছেন।

না-ওষুধ আর অকাজের ওষুধের কথা বাদ দিলে বলা যায়, কাজের ওষুধ নিয়মমতো খেতে হবে। তার জন্য আপনি সচেতন হোন। মোবাইলে অ্যালার্ম দিন, সম্ভব হলে ঘরের ও অফিসের দেওয়ালে ওষুধের নির্ঘণ্ট সেঁটে রাখুন। দাঁত মাজার ব্রাশের সঙ্গে সকালের ওষুধের পাতা আটকে রাখুন।

সম্ভাব্য ওষুধের নির্ঘণ্ট মেনে ওষুধ খাওয়ার ভুলকে নিশানা করে বাজারে এসে গেছে 'পিল প্ল্যানার'—প্লাস্টিকের খোপ কাটা বাক্স। এই বাক্স পরপারে যাবার অপেক্ষায় থাকা বৃদ্ধদের দেখবাল করা নাতি-নাতনিদের জীবন সহজ করে দিয়েছে। সপ্তাহে একবার সতেরো রকমের ট্যাবলেট-ক্যাপসুলের পাতা থেকে সানডে-মানডে-টুইসডে লেখা খোপে ভরে দিলেই পনেরো আনা কাজ শেষ। সানডে-মানডে-টুইসডে লেখা ওষুধের বাক্সের খোপে সকাল, দুপুর, বিকেল, রাত ইত্যাদি লেখা থাকে। প্রাইভেট নার্স বা কাজের মাসি খোপ থেকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বাকি এক আনা কাজ করে দেবেন। স্বতন্ত্র (এক্সক্লুসিভ) উপায় না থাকা প্রবীণদের জন্যও এইটুক কাজ নিজেকেই করে নিতেই হয়।

ওষুধ খেতে ভুলে যাবার সমস্যা সর্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী। সেই কথা মাথায় রেখে কম্বিনেশন পিলের উদ্ভাবন। দুটো বা তিনটে একই রোগের জন্য ওষুধ একটা ক্যাপসুল বা ট্যাবলেটে ভরে দিলে দেশের নিয়মফেরে ওষুধের দাম কম হয়, আদতে সতেরোটা ওষুধ খেলেও মনে হয় দুটো বড়ি কম খেতে হচ্ছে। ওষুধের দাম ও বোঝা হাল্কা হয়। কম্বিনেশন পিল ওষুধ ভুলে না যাওয়ার একটা দ্বিপাক্ষিক লাভের (win-win situation) ব্যবসায়িক উপায়। এরকম টু-ইন-ওয়ান আর থ্রি-ইন-ওয়ান ওষুধের ছড়াছড়ি ভারতবর্ষের বাজারে—অম্বলের ওষুধের সঙ্গে বমি বন্ধের ওষুধ, কোলেস্টেরলের ওষুধের সঙ্গে রক্ত পাতলা করার (আসলে রক্ত পাতলা করা হয় না, রক্তের স্বাভাবিক জমাট বাধার ক্ষমতাকে বাধা দেওয়া হয়) ওষুধ, একাধিক প্রক্রিয়ায় রক্তের চাপ কমায় এমন দুই বা তিনটি ওষুধের সংমিশ্রণ।

পলিপিলের উদ্ভাবনের প্রয়োজন আলাদা। পলিপিল হল একটা ক্যাপসুলে চার-পাঁচটি ওষুধের ককটেল। এই ওষুধ রোগের চিকিৎসার জন্য নয়, হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য সুস্থ, আপাত সুস্থ বা বিনা কষ্টের রুগ্ন মানুষের ভবিষ্যতের হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য উদ্ভাবিত। কী থাকে এই

ক্যাপসুলে? পলিপিল থাকে অল্প মাথার রক্তচাপ কমানোর ওষুধ, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ওষুধ, রক্তের জমাট বাধা ক্ষমতাকে কমানোর ওষুধ, হার্টকে কাজে বিশ্রাম দেওয়ার প্রয়াসে হার্টের গতি (heart rate) কমানোর ওষুধ আর প্রতিকূল পরিবেশে হার্টের পাম্প করার ক্ষমতা বজায় রাখার ওষুধ।

সব শেষে একটা বিষয় উল্লেখ না করলে কিছু প্রশ্ন বিনা উত্তরে গুমরে মরে। ওষুধ কতদিন আর দিনে কতবার খেতে হবে সেটা স্পষ্ট হলেও ওষুধ খাবার আগে না পরে খেতে হবে এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তাররা সাধারণত বলে ও সাংকেতিক অথবা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে দেন। সেটা লেখা না থাকলে মুস্কিল। বহু চেষ্টায় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে বলেন সুগারের এই ওষুধটা খেতে হবে খাবারের মাঝে—অর্ধেক খাবার পরে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, খাবার আগের ওষুধ বা খাবার মাঝের ওষুধ খেতে ভুলে গেলে খাবার পরে খেলে ক্ষতি নেই—একদম না খাওয়ার ক্ষতির চেয়ে সেটা কম ক্ষতির।

হাতে গোনা কিছু ডাক্তার রোগ নির্ণয়ে মতের অমিল হলে নিজের বুদ্ধির বদলে তথাকথিত উন্নত চিকিৎসা পরীক্ষার তোয়াক্কা করেন না। ইসিজি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ইসিজি মেশিনের চেয়ে নিজের বুদ্ধির উপরে ভরসা করেন। এমন ডাক্তার আজকাল পাওয়া যায় না। এই ডাক্তার এমনই একগুঁয়ে যে তিনি রোগী কী ওষুধ খাচ্ছেন সেই ওষুধের পুরনো প্রেশক্রিপশন দেখে সন্তুষ্ট হন না। তাকে ওষুধের পাতা দেখাতে হয়। এমন একগুঁয়ে ডাক্তাররা ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন।

**সতর্কবার্তাঃ** উপরের আলোচনা কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অধিকাংশের সম্মতিক্রমে প্রস্তুত নির্দেশিকা অনুসারী। ঘটনাচক্রে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিজ নিজ চিকিৎসকের মতের বিরূপ হলে সেই চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন।

পুরো রচনাটি যাঁরা পড়বেন না, তাঁদের জন্য জানাই এই নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে এই সমস্যার কথা।

***ওষুধ খেতে ভুলে গেলে কী করা। আমি ওষুধ ভুল সময়ে খেয়ে ফেলেছি, এবার কী করা। আমি ওষুধ খেয়েছি কিনা মনে পড়ছে না, তাহলে কী করব। মনে না পড়লে, কোনো ওষুধ একবার খেলেও আর একবার খেলে ক্ষতি নেই। কোন ওষুধ খেয়েছি কি খাই নি এই দোলাচলে না খাওয়াই উচিত। খাওয়ার আগের ওষুধ আগে না খেলে পরেও খাওয়া যায় কি?***

উমা

# কাশি-সর্দি কাফ সিরাপ

## মনোজিৎ মণ্ডল

শিশুদের কফ, সর্দি-কাশি খুব সাধারণ—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাল সংক্রমণের কারণে হয় এবং নিজের থেকেই ঠিক হয়ে যায়। তবুও কখন ওষুধ দিতে হবে, কখন না, এবং কোন পরিস্থিতিতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি—এসব জানা খুব প্রয়োজন।

**কাশি আসলে কী?**

কাশি (Cough) একটি 'প্রোটেকটিভ রিফ্লেক্স'—অর্থাৎ শরীরের প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে ধুলো, জীবাণু বা শ্লেষ্মা জমলে শরীর কাশি দিয়ে তা বাইরে বের করে দেয়। তাই সব কাশি খারাপ নয়; বরং এটি শরীরকে শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এই কারণে ছোটখাটো ভাইরাল কাশি হলে সিরাপ দিয়ে দমন করার চেয়ে শিশুকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম, তরল ও যত্ন দেওয়া অনেক বেশি উপকারী।

**কখন চিন্তিত হওয়া উচিত** — ঝুঁকির লক্ষণ : কাশির সঙ্গে নিচের যে কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে হবে বা জরুরি কক্ষে নিয়ে যেতে হবে—১) শিশুর শ্বাসকষ্ট (শ্বাস টেনে নেওয়া, বুকে ঢোকানো, নাক ফুলে ওঠা)। ২) অবসন্নতা বা অত্যধিক ক্লান্তি। ৩) খাওয়া না খাওয়া, বমি বা প্রস্রাব কমে যাওয়া। ৪) জ্বর ৩ দিনের বেশি থাকা বা ত্বকে ফুসকুড়ি ওঠা।

**সাম্প্রতিক কফ সিরাপ সংক্রান্ত ঘটনা:** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন দেশে ও ভারতে কিছু কফ সিরাপের মধ্যে দূষিত উপাদান (যেমন ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল) পাওয়া গেছে, যার কারণে শিশুদের মধ্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া ও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনাগুলির পর সরকার ও ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি নির্দিষ্ট কিছু 'কফ সিরাপ' নিষিদ্ধ করেছে। ফলে বাবা-মা ও চিকিৎসকদের এখন আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে; ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো কফ সিরাপ দেওয়া একেবারেই অনুচিত।

**কোন ওষুধ এড়িয়ে চলবেন (গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা):**

১) ডেক্সট্রোমেথোরফান (Dextromethorphan): ২ বছরের নিচে শিশুদের জন্য এটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, কারণ এতে শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রভাব পড়তে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ ৪ বছরের

নিচেও এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন। ২) ক্লোরফেনিরামিন + ফেনাইলএফ্রিন (Chlorpheniramine+Phenylephrine): ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ড্রাগ কন্ট্রোলার এই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশনকে ৪ বছরের নিচে ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে। ৩) ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) কফ-কোল্ড সিরাপ: এ ধরনের সিরাপে একাধিক উপাদান থাকে যা শিশুর শরীরে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। ডাক্তার ছাড়া এসব ওষুধ দেবেন না।

**ঘরোয়া উপায় ও প্রাকৃতিক যত্ন :** বেশিরভাগ শিশু ভাইরাল কাশি-সর্দিতে নিচের ঘরোয়া উপায়ে উপশম পায়—১)তরল পানীয় বেশি দিন : গরম জল, স্যুপ বা উষ্ণ দুধ কফ পাতলা করে কাশি কমায়। ২) স্যালাইন ড্রপ/স্প্রে: নাক বন্ধ থাকলে লবণজল (Sodium Chloride nasal drop/spray) ড্রপ শিশুর নাক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ৩) ঘরে আর্দ্রতা বজায় রাখুন; ভাপ বা হিউমিডিফায়ার কাশি ও গলা ব্যথায় আরাম দেয়। ৪) মাথা সামান্য উঁচু করে ঘুমানো : বড় শিশুরা এতে স্বস্তি পায়, তবে নবজাতকের ক্ষেত্রে ডাক্তারি পরামর্শ নিতে হবে। ৫) মধু (Honey) : এক বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য মধু একটি দারুণ প্রাকৃতিক উপশম। ঘুমের আগে ১ চা-চামচ মধু রাতের কাশি কিছুটা কমায়, ফলে শিশু ভালো করে ঘুমোতেও পারে। কিন্তু ১ বছরের নিচে শিশুদের কখনও মধু দেবেন না, কারণ এতে 'বোটুলিজম' নামক বিপজ্জনক সংক্রমণ হতে পারে।

**ওষুধ কবে প্রয়োজন ?** — হালকা ভাইরাল কাশি বা সর্দিতে সাধারণ যত্নই যথেষ্ট। তবে উচ্চ জ্বর, শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী কাশি, কফে রক্ত বা কানে ব্যথা থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসা নিতে হবে। শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শে নির্দিষ্ট কারণ অনুযায়ী (যেমন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, অ্যালার্জি) অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ওষুধ প্রয়োজন হতে পারে।

নিরাপদে ওষুধ ব্যবহারের টিপস ১) সবসময় প্যাকেটের নির্দেশনা ও ডোজ অনুসরণ করুন। ২) শিশুর ওজন ও বয়স অনুযায়ী ডোজ দিন, অনুমান করে নয়। ৩) ওষুধ মাপার জন্য সিরিঞ্জ বা মাপের কাপ ব্যবহার করুন। ৪) একই উপাদান (যেমন প্যারাসিটামল) একাধিক সিরাপে থাকতে পারে, দু'বার যেন না দেন, ৫) ওষুধ শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। ৬) প্রতিরোধে দৈনন্দিন যত্ন—হাত পরিষ্কার রাখা, শিশুকে ঠাণ্ডা ও ধুলোবালি থেকে দূরে রাখা এবং পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করা জরুরি। ৭) সুষম খাবার, শাকসবজি ও পর্যাপ্ত জল ফুসফুস ও ইমিউন সিস্টেমকে শক্ত রাখে। ৮) শিশুকে ঘরের ধোঁয়া, ধূমপান বা আগরবাতির ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন।

অনেকেই ঘরোয়া চিকিৎসা হিসেবে তেলে রসুন গরম করে শিশুদের বুকে-পিঠে মালিশ করেন। এটি বৈজ্ঞানিকভাবে কাশির চিকিৎসা নয়, তবে, গরম তেলের হাল্কা উষ্ণতা পেশি শিথিল করে এবং শিশুকে শান্ত ও আরামপ্রদ করতে পারে। এছাড়া রসুনে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান আছে।

**বিশেষ সতর্কতা :** ১. ছয় মাসের কমবয়সী শিশুদের এটি দেবেন না, ছয় মাসের বয়সের পর থেকে ব্যবহার করতে পারবেন। ২. তেল খুব গরম হলে পোড়া লাগতে পারে। ৩. শিশুর ত্বক খুব নরম ও স্পর্শকাতর, তাই মালিশ হালকাভাবে করতে হবে।

অনেকের মতে, মৃদু উত্তাপ ফুসফুসে জমে থাকা কফ বা শ্লেষ্মাকে তরল করতে সাহায্য করতে পারে, যদিও এই দাবির সপক্ষে নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

এটা মনে রাখা দরকার যে, এই পদ্ধতি কোনো অবস্থাতেই এটি ওষুধ বা চিকিৎসার বিকল্প নয়।

কাশি থাকলেও ঈষদুষ্ণ জল দিয়ে স্নান করানো যায়। স্নান করলে ঘাম, আঠালো ভাব, অস্বস্তি কমে, শিশু আরও আরাম পায়। এটি পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে, স্নান শেষে দ্রুত গা মুছে শুকনো জামা পরিয়ে দিতে হবে। তবে কোনো চিকিৎসক যদি সাময়িকভাবে স্নান করতে নিষেধ করেন তাহলে সেটাই মেনে চলতে হবে। **উ মা**

### যুবসমাজ আর চার্চে যায় না

আমেরিকার যুবসমাজ আজ আর চার্চে যেতে আগ্রহী নয়। এই চার্চ বিমুখী মানসিকতা ব্যবসায়ীদের নজর এড়ায় নি। বেশ কিছুদিন ধরে চার্চের বিশাল এলাকায় হয় শপিং মল নয়তো রেস্টরেন্ট চালু হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি কেনাবেচার সংস্থাগুলি সুযোগটা বেশ কাজে লাগাচ্ছে। উত্তর আমেরিকার আরেকটি দেশ কানাডা, ইলিন লিন্ডনার একজন সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন সেদেশে ২০৩০ সালের ভেতর প্রায় এক লাখ প্রোটেস্টান্ট চার্চ বাণিজ্যিক কাজে লাগানো যাবে। ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে একই চিত্র।

সূত্র : দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

# পরিচারিকাদের অবস্থান : একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

"ফুল ছুঁয়ে যায় চোখের পাতায় জল ছুঁয়ে যায় ঠোঁটে, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি রাত থাকতে ওঠে" (জয় গোস্বামী)। বলা বাহুল্য যে মাসিপিসিদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরাই আমাদের বাসন ধোয়া, ঘর মোছা, কাপড় কাচার মতো ঘরের কাজগুলো সামলে দেন সারাবছর। এঁরা একটি বিরাট সংখ্যক অসংগঠিত নারীশ্রমিক আজও যাঁদের শ্রমিকের স্বীকৃতি নেই, এমনকি শ্রমের মূল্যায়নের স্পষ্ট রেখাচিত্রও নেই। অথচ এঁদের দাবীদাওয়া যেমন ন্যূনতম মাইনে, ঘণ্টা ধরে মাইনে, সাপ্তাহিক ছুটি, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি বহুদফা দাবী নিয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে নেহাত কমদিন নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় 'বোনাস দিয়েছেন তো?' ও 'আইন আছে, অধিকার নেই' (প্রহেলী ধর চৌধুরী, ২৮.০৮.২০২৩), 'ভাঙা আয়না ফাটা মুখ' (স্বাতী ভট্টাচার্য, মে, ২০২৫) ইত্যাদি লেখার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। এসব দাবী তাঁদের হয়ে পেশ করেন যে সমাজকর্মীরা, এই লেখা মূলত তাঁদের উদ্দেশ্যেই।

স্রোতের বিপরীতে কথা বলা সর্বদাই বিপজ্জনক, বিশেষ করে তা যদি হয় শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষের বিষয়ে, তাহলে কাজটা আরোই কঠিন হয়, ভুল বার্তা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ আলোচনা ছাড়া কোনো সমস্যার সুরাহা হওয়াও অসম্ভব। পরিচারিকাদের সামাজিক অবস্থান ও দাবীদাওয়া বিষয়ক বিভিন্ন লেখা ও সমাজমাধ্যমে তার আনুষঙ্গিক আলোচনা পড়ে মনে হয় গৃহকর্তা-কর্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ক্ষুধার্ত বাঘ ও হরিণশিশুর মতোই একমাত্রিক; হিংস্র 'মালিক'দের কবলে থেকে কোনোক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই যেন এঁদের জীবন। কিন্তু এই দৃষ্টি নেহাতই একপাক্ষিক। ফলে এই বিষয়ে যে কোনো আলোচনা শুরু হয় ওঁদের দুরবস্থা ও নিয়োগকারীদের প্রতি একতরফা অভিযোগ দিয়ে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িই তা 'কাজের লোক' ও 'কাজের বাড়ির' দোষ-গুণ নিয়ে ব্যক্তিগত উদাহরণ ও অভিজ্ঞতার বৃত্তে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলে; দাবী ও অধিকারের কথা উঠতেই পারে না। তাই এই লেখাতে আমি প্রচলিত মতামতের বিপরীতে কোনো 'অ্যানেকডোটাল এভিডেন্স' অর্থাৎ আমি কি দেখেছি তার উল্লেখ করব না, বরং সামান্য অন্য সুরে কিছুটা নিরপেক্ষ আলোচনার চেষ্টা করব। কথাগুলো লিখে ফেলা খুবই দরকার কারণ এত বছরে পরিচারিকাদের তেমন কোনো সংগঠন তৈরি হল না কেন বা তাঁদের দাবীদাওয়াগুলো সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হল না কেন, তার উত্তর পেতে গেলে কিছুটা নিরপেক্ষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। এটা মূলত সেই বিশ্লেষণমূলক লেখা, কিছুটা দ্বিপাক্ষিক দাবীদাওয়ার কথাও এর মধ্যে চলে আসবে।

**গৃহশ্রমিক বিলের ভালোমন্দ** — সামাজিকভাবে বঞ্চিত মানুষদের হাতে প্রাপ্য অধিকার তুলে দিতে গেলে শুধু সহানুভূতিতে কাজ হয় না, প্রযোজনীয় পদক্ষেপও নিতে হয়। যেমন গত ১৬ জুন গৃহশ্রমিক দিবস উপলক্ষে কলকাতার একটি সংস্থা পরিচারিকাদের আঁকা কিছু পোস্টার থেকে (সমাজমাধ্যম মারফৎ) জানা গেল তাঁদের ন্যূনতম বেতন, সপ্তাহে একটি ছুটি, পুজোয় বোনাস এবং ৫৫ বছর বয়সে পেনশন ইত্যাদি দাবী রয়েছে। কথা হল, লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! নথিভুক্ত শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সুবিধার দাবী তো সরকারের কাছে পেশ হওয়ার কথা, সেটা হচ্ছে কি? উত্তর হল, হ্যাঁ, তাও হচ্ছে। এঁদের অনেক দাবীর কথা উল্লেখ করে ২০১৭ সালে রাজ্যসভায় 'গৃহশ্রমিক বিল' আনা হয়েছে। কিন্তু সেই বিল এখনো আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কিন্তু কেন সেটা হল না, কি করণীয় সেই সব আলোচনার বদলে ১৬ জুনের সম্মেলনেও সমস্বরে 'বাবুদের' বাড়িকে কাঠগড়ায় তোলাটাই চোখে পড়ল। এমনকি যাঁরা এঁদের দাবীগুলো তুলে ধরছেন তাঁরাও দেখলাম কিছু একতরফা দোষারোপের ছবি, ভিডিও ছড়ানো আর লড়াই, আন্দোলন, ভিউ, শেয়ার ইত্যাদি শব্দ নিয়েই খুশি, ন্যূনতম গঠনমূলক আলোচনাতে আগ্রহী নন। ফলে দিনের শেষে আসল ছবিটা বদলানোর সম্ভাবনা তৈরিই হল না।

২৫ পাতা গৃহশ্রমিক বিল মন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় সেটা কেন ঠাণ্ডা ঘরে পড়ে আছে। এর যে সামান্য অংশ

নিয়োগকারীর সঙ্গে কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে সরাসরি কথা বলে, সেইটুকু পড়লেও মনে হয় যাঁরা এই বিলের খসড়া রচনা করেছেন, এই বিষয়ে তাঁদের ধারণা আদৌ স্পষ্ট নয়। এই শ্রমিকরা যে ব্যবসায়িক সংস্থায় কাজ করা অন্যান্য শ্রমিকদের থেকে অনেক দিক থেকেই আলাদা সেটা এঁদের হিসেবের মধ্যেই নেই। তাই যে পরিচারিকারা দিনে আট থেকে বারো ঘণ্টা বা দিনরাতের জন্য কাজে লাগেন, তাঁদের কথা ভেবেই যাবতীয় নিয়ম তৈরি হয়েছে, কিন্তু বিশাল সংখ্যার যে পরিচারিকারা দিনে এক/দু'ঘণ্টা হিসেবে বিভিন্ন পরিবারে কাজ করেন, এইসব শর্তাবলী বেশির ভাগই তাঁদের স্পর্শ করে না। সর্বোপরি, গৃহশ্রমিকরা যদিও মূলত মহিলা সর্বত্র তাঁদের 'হি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটি, বার্ষিক ছুটি, বিশ্রাম ও টয়লেট ব্যবহারের অধিকার, নিরাপত্তা, সম্মান ইত্যাদি নিয়েই যাবতীয় কথা হয়েছে, যেন এইগুলোই সবচেয়ে বড় কথা, কিন্তু তাঁদের ন্যূনতম বেতনের অঙ্কটিই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আর এইখান থেকেই এই আলোচনা শুরু হতে পারে।

**পরিচারিকা বনাম বিনিয়োগকারী**—তবে তার আগে একটি বই-এর কথা বলব। 'গুরুচণ্ডালী' থেকে প্রকাশিত বইটির নাম *তাহাদের কথা*। সেখানে বিভিন্ন কায়িক শ্রমজীবী মহিলাদের কথা আছে তাঁদের নিজেদের বয়ানে। তার মধ্যে গৃহপরিচারিকারাও আছেন, যাঁরা প্রায় সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর যোগ্যতায় সেই পরিস্থিতিতে অন্য কোনো উপার্জনের রাস্তা ছিল না। সেই জায়গা থেকে তিনি যে উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, নিজের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তার পেছনেও তাঁকে যাঁরা কাজে রেখেছেন, তাঁদের ভূমিকা অনেকখানি। কিছুটা আর্থিক অনুদান, কিছুটা বিনা সুদে এককালীন ধার দিয়ে, শুভ বুদ্ধি দিয়ে তাঁরাই ওঁদের ভদ্রস্থ জীবনে পৌঁছোতে সাহায্য করেছেন। এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ। কিন্তু এই মহিলারা তাহলে কারা? পিছিয়ে থাকা মানুষকে যে কোনোভাবে সাহায্য করা কর্তব্য; তাই এইসব কাজের জন্য কেউ আলাদা কৃতিত্ব দাবী করেন না। সেইজন্যই মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পরিচারিকা নিগ্রহের ঘটনা উঠে এলেও এই ধরনের সাহায্যের ঘটনার কথা সেভাবে শোনা যায় না। কিন্তু তাতে সেই মানুষগুলোর জীবনে সেই সাহায্যের মূল্য কমে যায় না, এটাও ঠিক।

পরিচারিকাদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হতে গেলে কয়েকটা কথা মনে রাখা খুব দরকার। প্রথমত এঁরা নিঃসন্দেহে সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত, কিন্তু সেই বঞ্চনার মূলে আছে সমাজব্যবস্থা এবং এঁদের নিজেদের পরিবার, নিয়োগকারী নন। দ্বিতীয়ত, এঁদের 'কাজের বাড়ি'টা কোনো লাভজনক ব্যবসা নয়, নিয়োগকারীও 'মালিক' নন, এমনকি সবসময় খুব উচ্চবিত্ত মানুষও নন। বরং, এই অসংগঠিত, অ-প্রশিক্ষিত কর্মীদের কাছে এটা ভদ্রভাবে উপার্জন করার একটা উপায়। অর্থাৎ এটা পারস্পরিক সুবিধার্থে গড়ে ওঠা একটা সম্পর্ক। এঁদের শোষক ও শোষিত এই একমাত্রিক মডেলে খাপে খাপে বসাতে চাইলে এবং ধরাবাঁধা কিছু নিয়মের আওতায় আনলে তাঁদের মঙ্গল নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, বাবুদের কাছে নয়, এঁরা মূলত গৃহবধূদের (মাসিমা বা বৌদি) কাজে সাহায্য করেন, যাঁরা নিজেরাও নানারকম সামাজিক নিষ্পেষণের শিকার। এমনকি পরিচারিকারা নিজেরাও এক একজন গৃহবধূ। তাই এঁদের গৃহবধুদের বিপ্রতীপে দাঁড় করালে ভালো কিছু হবে না। যেমন, গ্রামের দিকে ১৫-২০ বছর আগেও কাজের লোক রাখার চল ছিল না। তেমন, রান্নার লোক রাখার চল এখনো বেশ কম। ঘরের কাজ মেয়েরা নিজেরাই করে নিতেন। পরবর্তীকালে গ্রামের মহিলারাই চাকরি করতে বেরোতে শুরু করেছেন বা তাঁদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে, যে জন্য তাঁদের সংসারের কাজ করতে এসেছেন নিম্নবিত্ত পরিবারের সেই মেয়েরা যারা চাষের মাঠে কাজ করতেন (এখনো করেন) বা মাটি কাটতেন। এটা কিন্তু উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়েছে কারণ মাটি কাটা বা চাষের কাজরে চেয়ে ঘরের কাজে সাহায্য করা কম পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং নিজের সংসারেও কিছুটা দেখভাল করা যায়। সুতরাং এই মহিলাদের মঙ্গল করতে গেলে এমন কিছু দাবী করা যাবে না যাতে গ্রামীণ বা শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারে এঁদের কাজ পাওয়াটাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

**বেতনক্রম ও ছুটির দাবী** —পরিচারিকাদের প্রথম দাবী হল (ন্যূনতম) বেতন, যা নিয়ে সর্বদাই কিছু দর কষাকষি চলে। যে সব বিষয়েকোনো কোনো ধরাবাঁধা 'দর' নেই, সেখানে দুপক্ষই 'ঠকে যাবার' ভয়ে ভোগেন। যে কারণে লোকে 'বাঁধা দামে'র দোকানে ঢুরে নির্দ্বির্ধায় হাজার হাজার টাকার কেনাকাটা করলেও ফুটপাতের জিনিসপত্র কিনতে গিয়ে পঞ্চাশ চাকার জন্যও দর কষাকষি করেন, ব্যাপারটা তেমনই।

তাই উভয়েই কমিয়ে বলা ও বাড়িয়ে বলার চক্রে ঢুকে পড়েন। নিরপেক্ষভাবে করলে ঘণ্টাপ্রতি হিসেবে এই বেতন এখনও খুবই কম। তাই প্রথম দাবী অবশ্যই পরিচারিকাদের জন্য ন্যূনতম বাজারসই বেতন ও একটা বেতনকাঠামো স্থির করা। তবে বিষয়টি বহুস্তরীয়। যেমন এই বেতন কি সব পরিচারিকার একই হবে? কারণ এমনিতে এক ঘণ্টা রান্না ও এক ঘণ্টা বাসনমাজা, ঘর মোছার বেতন সমান হয় না। তাই ন্যূনতম একটা বেতন ঠিক করা ও কাজের চাপ অনুযায়ী কিভাবে বেতন কিছুটা সংশোধন হবে সেটাও উল্লেখ করতে হবে। সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া এটা সম্ভব নয়। এছাড়া নথিভুক্ত পরিচারিকাদের কাজকে একশ দিনের কাজ বা সমতুল্য কোনো প্রকল্পের আওতায় আনা যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখা যায়। এঁদের পেনশনের বিষয়ে গৃহশ্রমিক বিলে কিছু 'স্কিম'-এর প্রস্তাব আছে, যেটা কার্যকর করতে পারলে এঁরা প্রভূত উপকৃত হবেন। মনে রাখতে হবে সব কাজের শর্ত ও প্রকৃতি সমান নয়; ধরাবাঁধা 'অফিস জব'-এর বাইরে ডাক্তার-নার্স-পুলিশ-সংবাদকর্মী বিভিন্ন পেশার লোকজন বিভিন্ন রকম শর্তে কাজ করেন। কারণ অনেক কাজই 'পরে করে নেওয়া' যায় না। পরিচারিকারাও রান্নাবান্না-ঘর পরিষ্কার, বয়স্কদের দেখাশোনা ইত্যাদি সেই সব কাজই করেন বা তাতে সাহায্য করেন যা পরের দিন করব বলে ফেলে রাখা যায় না, এবং যার থেকে নিয়োগকারী কোনো মুনাফা করেন না। তাই গৃহশ্রমিক বিলে যেভাবে ৮ মাস টানা কাজ করলে পনেরো দিন এমনি ছুটি (আর্নড লিভ), ১মাস অসুস্থতার ছুটি, ৩ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদির দাবী রয়েছে, সেই সময়ে এই কাজগুলোর কি ব্যবস্থা হবে সেটাও ভাবা উচিত। সেই দীর্ঘ ছুটির সময় তাঁদের করণীয় কাজের চাপ কি গৃহবধুটিকেই সামলাতে হবে! সবাই জানেন, প্রচলিত ব্যবস্থায় ১৫ দিন বা ১ মাসের জন্য পরিচারিকা পাওয়া যায় না, সেইজন্যই লম্বা ছুটিতে যাবার সময় পরিচারিকা নিজে লোক দেখে না দিলে তাঁর বদলে অন্য লোক বহাল করতেই হয়। এই কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না বলেই যাঁরা খোলাপাতায় পরিচারিকার পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেন, তাঁরাও নিজের জীবনে সর্বদা সেই অবস্থান বজায় রাখতে পারেন না।

তবে পরিচারিকাদের জন্য কিছু করতে গেলে সবচেয়ে আগে তাঁদের সমস্যাগুলো তাঁদের অবস্থান থেকে দেখতে আর বুঝতে হবে; অর্থাৎ বাস্তবিকই তাঁদের কার কি কতটা দরকার সেটা জানতে হবে। কারণ পরিচারিকারা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এলেও তাঁদের সকলের অবস্থান সমান নয়। কেউ সংসার চালাবার জন্য কাজ করেন; এঁরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে ট্রেনে করে এসে সারাদিন বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে দিনের শেষে বাড়ি ফেরেন। দু'পক্ষের প্রয়োজন ও সুবিধার হিসেব একরকম নয়। প্রথম দলের মহিলাদের কাছে মাইনের অঙ্কটা খুব বড়, যে কোনো কাজে তাঁদের আপত্তি নেই। দ্বিতীয় দলের কাছে কাজের বাড়ির দূরত্ব, কাজের ধরণ, সময় ও পরিবেশটা বিবেচ্য। তেমনি প্রথম দলের কাছে সপ্তাহে একদিন ছুটি তাঁদের যতটা দরকার, যাঁরা কাছাকাছি বাড়িতে কাজ করেন তাঁদের পক্ষে নিজের দরকার মতো একসঙ্গে দু-তিন দিন ছুটি নেওয়াটা বেশি সুবিধাজনক। তাই আমরা সপ্তাহান্তে ছুটি পাই বলেই সেই মডেলটাই ওঁদের ক্ষেত্রেও ততটা প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। তেমনি ঘণ্টা বেঁধে মাইনে (যা অনেক কর্মক্ষেত্রে চালু আছে) ঠিক হলে যিনি একটু ধীরেসুস্থে কাজ করেন কেউ তাঁকে কাজে রাখতে চাইবেন না। আমাদের কাজের জায়গায় সবাই আপনি সম্বোধন করেন বলে পরিচারিকাও 'আপনি' সম্বোধনই আশা করেন বা মাসিমা-বৌদিদের 'আপনি'ই বলেন এমন নাও হতে পারে। তেমনি মাইনের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে কেউ বোনাসটা হাতে পেতে চাইলেও কেউ আজও পুজোয় নতুন শাড়ি-সায়া-ব্লাউজই পেতে চান। কারণ টাকা সংসারে খরচ হয়ে যায়, শাড়িটা নিজেরই থাকে।

**সুতরাং পরিচারিকাদের কথা অবশ্যই ভাবা দরকার, কিন্তু বিষয়টা যেহেতু বহুমাত্রিক তাই কাজটা সহজ নয়। সব পেশার মতো 'এক্সপ্লয়টেশন' আছে, যৌন হয়রানি আছে, অত্যাচার আছে এখানেও। তেমন কিছু হলে এঁরা কার কাছে যাবেন, সেটা এঁদের স্পষ্ট জানা থাকা দরকার। তাই এঁদের সংগঠন অবশ্যই দরকার যাতে পায়ের তলার জমিটা শক্ত হয়। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের কাজের শর্ত এবং 'কাজের বাড়ির' চরিত্র আলাদা আলাদা বলে সেই সংগঠন তালিকা ধরে একইরকম নিয়ম সকলের জন্য আরোপ করতে পারে না।**

তৃতীয় যে ধরনের পরিচারিকারা একই বাড়িতে ৮, ১২

বা ২৪ ঘণ্টা কাজ করেন তাঁদের জন্য গৃহশ্রমিক বিল-এর অনেক ধারাই প্রযোজ্য। কিন্তু তাঁরা অনেক সময়ই বিভিন্ন 'সেন্টার'-এর মাধ্যমে নিযুক্ত হন, যাঁরা মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবসা করেন। ফলে এই পরিচারিকারা আসলে দ্বিস্তরীয় নিয়োগ ব্যবস্থার অধীনে কাজ করেন। একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে নিযুক্ত হন বলে বেতন ও অন্যান্য বিষয়ে এঁরা কিছু নিয়মের অধীনেই থাকেন। তবে তাঁদের কাজ, বেতন ও ছুটির ব্যাপারগুলো সাধারণ পরিচারিকাদের থেকে এতটাই আলাদা যে এই বিষয়টি আলাদাভাবে আলোচনা করা সিঙ্গত।

**বর্তমান অবস্থা** —এসব তাত্ত্বিক কথা পরে এবার কিছু বাস্তব চিত্র দেখা যাক। গ্রাম-শহর উভয় ক্ষেত্রেই পরিচারিকার প্রয়োজন ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু বিভিন্ন বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা থাকায় তাঁদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই পরিচারিকাদের ছুতোনাতায় 'কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া, মাইনে না দেওয়া বা ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নেওয়া এসব এখন অনেক কমে গেছে। বরং পরিচারিকারা মুখের ওপর না বলতে অভ্যস্ত হয়েছেন, হিসেবের বাইরে কাজের জন্য বাড়তি মাইনের কথা বলতে শিখেছেন। ছুটিও শাড়ি/বোনাসের ব্যাপারে নিজের মতো চুক্তি করে নিতে শিখেছেন। এসব না পেলে এঁরা সেই বাড়িতে কাজ করেন না। আর সেই চুক্তি দু-তরফে মেনে চললে কেউ কেউ একই বাড়িতে বহুদিন কাজ করে চলেন, না হলে ঘন ঘন বদলায় কাজের বাড়ি কিংবা কাজের লোক, কেউই সমাজসেবা করেন না।

সুতরাং এখনকার দিনে কাজের লোক আর বাড়ির লোকের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই একতরফা শোষণের নয়। কিছুটা পারস্পরিক সমঝোতা এবং খুব খারাপ হলে পারস্পরিক শোষণের (এক্সপ্লয়টেশন)। মোটের ওপর এই সম্পর্কটাও সময়ের দাবী মেনে অনেকটা আধুনিক হয়েছে। গৃহকর্ত্রীও বিনা পয়সায় কোনো বাড়তি কাজের কথা বলেন না (জানেন, বললেও করবে না), পরিচারিকাও ছুটি নিতে হলে আগে জানিয়ে রাখেন বা অন্তত আগের দিন ফোনে জানিয়ে দেন। বয়স্ক মাসিমার কথা ভেবে কেউ শরীর খারাপ নিয়েও কাজ করে যান, নিজের বাড়িতে তালের বড়া হলে বাড়ির বৌদির জন্য নিয়ে আসেন, কেউ দুখানা রুটি বেশি করতে হলে মুখ ভার করেন বা পারব না বলেন; এমনকি একই মানুষই দুরকম আচরণ করতে পারেন। কে এমন আচরণ করবেন তার কোনো ধরাবাঁধা হিসেব নেই। কেউ সোনার গয়না পেয়ে ফিরিয়ে দেন, কেউ সুযোগ পেলেই ব্যাগ থেকে টাকা সরান, সবই হয় (আমার জীবনে দুটোই ঘটেছে)।

সুতরাং পরিচারিকাদের কথা অবশ্যই ভাবা দরকার, কিন্তু বিষয়টা যেহেতু বহুমাত্রিক তাই কাজটা সহজ নয়। সব পেশার মতো 'এক্সপ্লয়টেশন' আছে, যৌন হয়রানি আছে, অত্যাচার আছে এখানেও। তেমন কিছু হলে এঁরা কার কাছে যাবেন, সেটা এঁদের স্পষ্ট জানা থাকা দরকার। তাই এঁদের সংগঠন অবশ্যই দরকার যাতে পায়ের তলার জমিটা শক্ত হয়। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের কাজের শর্ত এবং 'কাজের বাড়ির' চরিত্র আলাদা আলাদা বলে সেই সংগঠন তালিকা ধরে একইরকম নিয়ম সকলের জন্য আরোপ করতে পারে না। পরিচারিকারা নিজেরাও সেটা জানেন; তাই সমাজকর্মীদের বানানো দাবীর তালিকা থেকে বেশিরভাগ পরিচারিকা নিজেরাই সরে আসেন।

বয়স নির্বিচারে পরিচারিকাকে নাম ধরে ডাকা বা তুই-তোকারি করা এখন অনেকটাই বদলে গেছে। তবু পরিচারিকার পেশায় কেউ শখ করে আসেন না, নিরুপায় না হলে নিজের সন্তানকে কেউ এই পেশায় আনতে চান না। সুযোগ পেলেই এই পেশা থেকে সরে যান। অর্থাৎ এঁরা নিজেরাই এঁদের পেশাকে সম্মানজনক মনে করেন না। সেটা শুধু আর্থিক কারণেই নয়, এঁদের শ্রমের মূল্য প্রতিষ্ঠা হয় নি বলে। এটা এঁদের অপরাধ নয়, এটাই সামাজিক নির্মাণ। এটাও এঁদের সংগঠিত হতে না পারার একটা কারণ। তার পেছনেও হয়তো গৃহশ্রমের মূল্যহীনতার ধারণা আছে। শ্রমের সম্মান না থাকলে শ্রমিকের সম্মান কি করেই বা থাকবে! কলেজ পড়ুয়া ঝকঝকে তরুণী যদি হাতখরচা জোগাড় করতে আমাদের বাড়িতে এসে বাসন ধুয়ে দিতে চায় বা রুটি করে দিতে চায়, তখন কি কেউ তাকে কম মাইনে দেবার সাহস দেখাতে পারবেন!

**পুনশ্চ ঃ এই লেখাকে যদি কারোর একপেশে (মালিক পক্ষের দিক ঘেঁসা) মনে হয় তাহল যথাযথ যুক্তিসহ ঝাঁপিয়ে পড়ুন। তবে পরিচারিকাদের টেবিলে বসা-না-বসা, টয়লেট ব্যবহার করতে না দেওয়া এমন কি পরিচারিকাদের অধিকার ও দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে আমার মতামত ও বিশ্লেষণ এই লেখায় উহ্য রইল।**

উমা

# ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের অন্যতম পুরোধা রাজা রামমোহন

নন্দগোপাল পাত্র

রামমোহনকে (১৭৭২-১৮৩৩) যোগ্য সম্মান জানাতে এখনও এক শ্রেণির মানুষের সন্দেহ রয়েছে। সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ভারত-আত্মাকে জানার এবং অনুভব করা দায়িত্ব আমাদের। আজ আমরা তাঁরই দেখানো পথ অনেকাংশে গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছি। আধুনিক ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন তিনি কিন্তু পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় দেখতে পেলেন না বিশেষ কেউ, অনুষ্ঠান ছাড়াই ভিত্তিপ্রস্তর তাও আবার স্বার্থান্বেষী উন্মত্ত বিরোধীরা নিন্দায় ভরে দিলেন সমগ্র দেশ, ভিত্তিপ্রস্তরের সময়ে কোনো আচার অনুষ্ঠান নেই, এমনকী কোথায় ভিত খোঁড়া হল কেউ দেখতে পেলেন না। ভিত তো একদিনে হয় নি, প্রস্তুতিপর্ব চলেছে অনেক দিন ধরে, রক্তের অক্ষরে চিনেছেন সত্যকে। সত্য যে খুব কঠিন! নীরবতা সঙ্গী ছিল তাঁর। দিনে দিনে সাহস সঞ্চয় করেছেন তিনি, প্রতিরোধ যত তীব্র হয়েছে, সংকল্প হয়েছে আরো স্থির, আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বৃক্ষের মতো, আত্মবিশ্বাস ছড়িয়েছে ডালপালা। আত্মধারণ ক্ষমতা বাড়িয়েছেন ঝড়ের মুখে, তিনি জেনে গেছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। কিন্তু তাঁকে সহযোগিতা করার কেউ নেই। ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে শিখেছেন বৈদিক ভাষা, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজি, গ্রীক, হিব্রু, বাংলা ল্যাটিন, ফরাসীসহ দশটি ভাষা।

আত্মসমাহিত পুরুষ রামমোহন সাধারণের কাছে সতীদাহ প্রথা রদ করিয়েছিলেন এই কারণে বেশি পরিচিত। তাঁর অন্যান্য গুণের পরিচয় খুব কম মানুষ জানেন, চর্চাও তেমন হয় না। মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে অগ্রদূত হয়ে পথ দেখিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের বীজ বপন, শিক্ষা বিস্তার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন, বেদ উপনিষদ থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ, ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তির পথ, বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদ, বিজ্ঞান চর্চার উদ্যোগ, নারীর বাঁচার অধিকার, নারীর সম্পত্তিতে অধিকার, ভূমি সংস্কারে কৃষকের অধিকার, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের উদ্যোগ, বাংলা ধ্রুপদী গানের বিস্তার, লবণ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, জাতিপুঞ্জ গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ ইত্যাদি মানবিক কর্ম প্রয়াসে তাঁর অনন্য ভূমিকা। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রামমোহন হলেন প্রথম মনীষী যিনি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারতবর্ষকে আলোকিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় সক্ষেত্রে সফল হন নি কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর কাজের ফল আমরা ভোগ করছি।

রামমোহনের কাছে ইংরেজ সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তি হল শিক্ষা—যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা। এখন থেকে ১০২ বছর আগে তিনি বুঝেছিলেন, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে আগামী ১০০ বছরেও ভারতের ঘুম ভাঙানো যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচলিত ধারায় হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনায় কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ খোলার সিদ্ধান্ত নিল তখন রামমোহন তার বিরোধিতা না করে পারেন নি। তিনি ১২ ডিসেম্বর ১৮২৩-এ গভর্নর জেনারেল (১৮২৩-১৮২৮) লর্ড আমহার্স্টকে (১৭৭৩-১৮৫৭) একটি দীর্ঘ পত্র লিখে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই চিঠিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি যদি আর কিছু না-ও করতেন বা লিখতেন অন্তত এই চিঠিটির জন্য ভারতীয়দের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। পত্রটির মূল বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে এইরকম ঃ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে তা এদেশে বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে। তাছাড়া সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে তা পুরোপুরি আয়ত্ত করার জন্য প্রায় জীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। গভর্নমেন্টের যদি মনে হয় যে এদেশের অনেক অমূল্য সম্পদের কথা এই ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, তাকে জানার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন, তাহলেও নূতন করে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার দরকার নেই। এদেশে বহু পণ্ডিত এই ভাষা শেখানোর কাজে ব্যাপৃত আছেন, এদের উৎসাহ ও সাহায্য দিলে গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষাখাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তার সমস্তটাই সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় করা মোটেই ঠিক নয়। যদি ইংরেজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হতো তাহলে প্রাচীন স্কুলমেনদের (Schoolmen) অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হতে না দিলেই হতো, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখতো। সেরকম গভর্নমেন্ট যদি এদেশের জনসাধারণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ রাখতে চায় তাহলে অবশ্য এই ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু

গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য যখন তা নয়, তখন উদার ও প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত—যাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে গণিত, রসায়ন, দেহতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ও জড় ও জীববিজ্ঞান পড়ানো যেতে পারে। শিক্ষাখাতে যে ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে তা দিয়ে ইউরোপের কয়েকজন গুণী ও প্রতিভাবান শিক্ষক নিয়োগ করে, প্রয়োজনীয় বই ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি সহযোগে আধুনিক শিক্ষার একটি কলেজ গড়ে তোলা যেতে পারে।

রামমোহনের শিক্ষা চিন্তার বিভিন্ন দিকগুলি বোঝার জন্য তাঁর চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিটিকে বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞানভাবনা, সংস্কৃতচর্চা, ধর্মশিক্ষা ও জনশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট বোঝা যায়। রামমোহন সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হলেও বিজ্ঞানশিক্ষাকে আহ্বান করেছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটাতে। রামমোহন তাঁর চিঠিতে বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) নাম তিনবার উল্লেখ করেন। বেকনের চিন্তাধারা ইউরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, রামমোহন তা উপলব্ধি করেন এবং স্বদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সে ধারা প্রবর্তনের জন্য দাবি জানান। রামমোহন যে সব বিষয় প্রবর্তনের দাবি করেন সেগুলি হল : Mathematics, Natural Philosophy (তৎকালীন সময়ে Physics এই নামে পরিচিত ছিল), Chemistry, Anatomy , 4 other useful sciences.

রামমোহনের মতে ইউরোপীয় দেশগুলি বিজ্ঞানচর্চার ফলেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

রামমোহনের মতে, ইউরোপীয় দেশগুলি বিজ্ঞানচর্চার ফলেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। উল্টোদিকে এপর দেশগুলির পিছিয়ে পড়ার কারণ বিজ্ঞানচর্চার অভাব। বিজ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে তাই রামমোহন লেখেন : "The Nations of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world". রামমোহনের কাছে বিজ্ঞানচর্চা নিছক সাধারণ জ্ঞান সাধনা নয়; একাধিকবার তিনি 'useful', 'beneficial to the country' কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। রামমোহন লিখেছিলেন: "so that the stream of intelligence may flow into the most useful channels." এর অর্থ হল, রামমোহন বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানকে প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন দেশে আধুনিক শিল্প গড়ার জন্য। শুধু নিজের জন্য নয়, এশিয়ার দেশে দেশে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্বপ্ন দেখেছিলেন রামমোহন।

রামমোহন পাটনায় থাকার সময় (১৭৯৯) আরবি ভাষায় ইউক্লিডের (গ্রীক গণিতজ্ঞ) জ্যামিতি এবং মূল ল্যাটিনে নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) প্রিনিসিপিয়া পাঠ করেছিলেন। কলকাতায় তিনি ম্যাকে নামে একজন জার্মান শিক্ষকের কাছে উচ্চমানের গণিতও শিক্ষা করেন। ফার্গুসন রচিত Introduction to Astronomy বইয়ের অনুবাদ করেন তিনি, খুব সম্ভবত সেটিই 'খগোল' নামে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া রামমোহন ভূগোল এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি বাংলায় লেখেন। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য সংবাদ কৌমুদীতে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন।

রামমোহন চেয়েছিলেন প্রকৃত শিক্ষা তথ্য সর্বস্ব হবে, বরং বুদ্ধি, বিবেক ও হৃদয়ের অনুভূতিকে বিকশিত ও সুসংহত করবে এবং পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলবে। পুরনো সমাজ ব্যবস্থায় যে সামাজিক নীতিবোধ চালু ছিল নতুন সমাজে তা অচল। নতুন মূল্যবোধ জীবনে মিশে না গেলে শিক্ষা বাহিরের কৃত্রিম ঠাট হয়ে পড়ে; উত্তরণের পথে এই সংকট দূর করতে রামমোহন শিক্ষাক্ষেত্রে এথিকস-এর ওপর গুরুত্ব দেন।

রামমোহনের মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে জনশিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার প্রধান সহায় ছিল মুদ্রণ মাধ্যম অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্র। রামমোহন স্কুলবুক সোসাইটির সদস্য না হলেও বাইরে থেকে অনেক পাঠ্যপুস্তকলিখে তিনি সহযোগিতা করেছেন। যেমন জিসিপিআই-এর অনুরোধে তিনি প্রথমে লেখেন ভূগোল ও খগোল নামে দুটি বই। পরে ছাত্রদের সুবিধার্থে রচনা করেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি অনেকগুলি সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন, যেমন বাঙ্গাল গেজেটি (১৮১৮), ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১), মীরাং উল আখবার (১৮২২), বঙ্গদূত প্রভৃতি। রামমোহন সম্বাদ কৌমুদী-র প্রথম সংখ্যায় (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) জনগণের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার ও রাষ্ট্রের সে সম্পর্কে দায়িত্বের উপর প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং -এর যুগে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়াবার যে প্রস্তাব তাতে তিনি রাখলেন, তা শুধু দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পক্ষেও অভিনব।

রামমোহন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার প্রকাশিত পত্রিকায় বিজ্ঞানের ওপর অনেক রকম প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতেন। সেরকম একটি প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ পৌত্তলিক সম্বাদ'-এ তিনি লেখেন: 'সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রতে পৃথিবীকে গোল ও শূন্যস্থায়ী কহিয়াছেন ও পৃথিবী ছায়ার দ্বারা চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং সূর্যের উত্তাপের দ্বারা জল কর্ষণ হইয়া বৃষ্ট্যানি হয়।.....মেঘের ঘর্ষণ দ্বারা শব্দ হইলে কহ দেবতারা গর্জিতেছেন দৈবাধীন হাঁচি হইলে ও টিকটিকি শব্দ করে এ সময়ে কর্মে প্রবৃত্ত হইলে অকল্যাণ হইবে। মনুষ্যকার ব্যক্তিকে অরূপ জড়ের ব্যবহার করিতে দেখিলে মনস্তাপ হয়।'

বর্তমান সময়ে ভারতও বোধহয় দাবি করে রামমোহন চর্চা। তাঁর ব্যর্থতা, ভাবনার সীমাবদ্ধতা, এগুলোর আলোচনা নিশ্চয়ই দরকার আছে। কিন্তু আরও বেশি দরকার আমাদের আত্মসমীক্ষার। যেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে উঠে আসবে আমরা কি রামমোহনকে সত্যিই চিনেছি না চেনার চেষ্টা করেছি?

আধুনিক ভারতবর্ষের আবির্ভাবে রামমোহনের অতুলনীয় ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে: 'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন, তাহা ভালো করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙালি বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব, রামমোহন রায় বাঙালি ছিলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই জন্যই তাঁকে 'ভারতপথিক' উপাধি দেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে। এই পণ্ডিত , সমাজসংস্কারক ও দেশপ্রেমী মানুষটি জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যক্তিত্ব সব দিক থেকে ছিলেন ভারতের নবযুগের প্রাণপুরুষ। ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিকীকরণের অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন। তাঁকে নিয়ে এখনও গবেষণা করে চলেছেন দেশ-বিদেশের ইতিহাসবিদরা। সন্দেহ জাগে, একবিংশের ভারত কি এই মহামানবের নাগাল পেয়েছে?

ঋণ ও সহায়তা : ১) রবীন্দ্র রচনাবলী সুলভ সংস্করণ বিশ্বভারতী, সপ্তদশ খণ্ড (মাঘ, ১৪২৬),২) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ১৪১৯ ৩) পান্থজন জানুয়ারি-মার্চ ২০২২, ৪) দেশ ১৭ মে ২০২২, ৫) আনন্দবাজার পত্রিকা ২২মে ২০২২। উমা

# প্রতিবেদন

## আমাদের ঘরের কাছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কতটা নিরাপদ?

বিভিন্ন সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী ২০২৫-এর ১৮ অক্টোবর অপরাহ্নে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। কার্গো ভিলেজের যে অংশ আগুনে পুড়ে যায় সেই অংশটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বৃহৎ পোশাক শিল্পের জন্যে আমদানিকৃত প্রচুর কাপড়ের পেটি, যা খালাসের জন্যে অপেক্ষা করছিল, বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল, বাংলাদেশের প্রথম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৮ টন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রাশিয়া থেকে আনা হয়েছিল, যা ঐ কার্গো ভিলেজের পুড়ে যাওয়া অংশে মজুত ছিল। এই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম খালাসের জন্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছিল। এই ক্ষতির কারণে, প্রথম ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষ করার সময়সীমা পিছিয়ে যাবার সম্ভাবনা, চুক্তি অনুযায়ী দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ ২০২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়ার কথা। প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে।

রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়, পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলায় পদ্মা নদীর তীরে রূপপুর অঞ্চলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দুটি ইউনিট চালু হওয়া পথে, প্রতিটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০ মেগাওয়াট। আনুমানিক প্রকল্প ব্যয় প্রায় এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কোটি বাংলাদেশের টাকায়। চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়ায় ফেরত পাঠাতে হবে। রূপপুরের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণনগরের দূরত্ব প্রায় ১৫০ কিলোমিটার আর কলকাতা প্রায় ২৭০ কিলোমিটার। ঢাকার দূরত্ব হবে ১৭০ কিলোমিটার। তাই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কিছু সরঞ্জাম বিমানবন্দরে আগুনে পুড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে। যদিও বলা হয়েছে যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল রিঅ্যাক্টর বা চুল্লি পঞ্চমস্তরীয় সুরক্ষা বলয়ে থাকবে, তবুও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করাটা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে বর্জ্য পরিবহনে অতি সতর্কতা প্রয়োজন। আশা করা যায় সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদনে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে, আমাদের দেশ নিশ্চয়ই এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

উল্লেখ করা হয়েছে যে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে বৃহত্তম একক অবকাঠামো প্রকল্প। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সাথে জড়িত একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রূপপুরে কাজের গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে যায়। পরিবর্তিত চুক্তি অনুযায়ী রিঅ্যাক্টরে পারমাণবিক জ্বালানি ভরার জন্য তাদের ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত, তারপরেই পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হতে পারে। তবে অনুমান বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ কমপ্লেক্সে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রকল্প রূপায়নে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা। রূপপুরের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কতটা সচেতন?

**প্রতিবেদক : শ্যামলকুমার ভদ্র**

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৭ তম বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯৪৩৩০৩৬৫৩৩

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ কলকাতা ২৫০ টাকা/ কলকাতার বাইরে ৩০০ টাকা পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

**Punjab National Bank,**
**College Street Branch,**
**Kolkata - 700073.**
**UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838.**
**IFSC NO. PUNB0008320**

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। মোবাইল নম্বর সহ পুরো ঠিকানা পত্রিকার ই-মেইলে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে জানাতে হবে। কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হতে চান তা উল্লেখ করতে হবে।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
**Facebook : https://www.facebook.com/**

## পুস্তক তালিকা

| | |
|---|---|
| জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে: | |
| বোলান গঙ্গোপাধ্যায় | ১৫০.০০ |
| স্বাস্থ্যের সাতকাহন ১ম খণ্ড : গৌতম মিস্ত্রী | ২০০.০০ |
| আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী | ৮০.০০ |
| চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ | ১৫০.০০ |
| বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন) | ২০০.০০ |
| আহরণ (সংকলন) | ২০০.০০ |
| যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ১৮০.০০ |
| প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ) | ১৩০.০০ |
| বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন) | ২০০.০০ |
| বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন) | ২০০.০০ |
| বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক | |
| নিরঞ্জন ধর | ১২০.০০ |
| প্রমিথিউসের পথে (সংকলন) | ৫০.০০ |
| লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় | ২০০.০০ |
| যুক্তিবাদের চার সেনাপতি | |
| অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায় | ৬০.০০ |
| শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন) | ১২০.০০ |
| গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ | ১৫০.০০ |
| নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | ৫০.০০ |
| এটা কী ওটা কেন (সংকলন) | ৫০.০০ |
| মূল্যবোধ (সংকলন) | ৮০.০০ |
| প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ: | |
| অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩০.০০ |
| বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু: | |
| হিমানীশ গোস্বামী | ৪০.০০ |

**প্রাপ্তিস্থান :** পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।
হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।